বাঘের থ

অনীশ দেব



এক

ছিটকে গিয়ে পড়লাম ঘরের কোনায় রাখা শৌখিন টেবিলটার ওপর। মট করে ভেঙে গেল ওটার পায়া। টেবিলের ওপর থেকে কাঁচের গ্লাসটা মাটিতে পড়ে ঝনঝন করে ভেঙে গেল। আবার যখন ভালো করে তাকালাম, তখন আমার জিভের ডগায় নোনতা স্বাদটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রায় ছ'ফুট লম্বা লোকটি পায়ে-পায়ে আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'আমার কাছে রিভলবারও আছে।'

এ-কথা বলার কোনওই প্রয়োজন ছিল না। কারণ ওর একটা ঘুষিতেই আমি সরষেফুল দেখছিলাম। কোনওরকমে বললাম, 'কী—কী চাই তোমার?' যদিও মনে-মনে ভালোই বুঝতে পারছিলাম যে ও কী চায়।

লোকটি বলল, 'পাণ্ডুলিপিটা।'

ওই ব্যথার মধ্যেও আমার চোখে বোধহয় একটা সপ্রশ্ন দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল। সেটা দেখে লোকটি বলল, 'আমার দলের চিহ্ন—।' বলে একটা কাগজ ওর জামার বুক-পকেট থেকে বের করে আমার হাতে দিল।

কাগজটার মধ্যে লাল রঙ দিয়ে তোলা একটা হাতের পাঞ্জার ছাপ। ওটা দেখছিলাম, লোকটির কথায় আমার চমক ভাঙল: 'আমি "লালপাঞ্জা" দলের কমরেড।'

আমি হেসে বললাম, 'এটা খুব উঁচুদরের অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট, ঠিক ধরতে পারছি না। তবে মনে হয়, ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্রতীরে সূর্যোদয়ের ছবি, তাই না?'

উত্তরে একটা বুটসুদ্ধ ভারি পা দড়াম করে এসে পড়ল আমার চোয়ালে : 'পাণ্ডুলিপিটা বের করে দাও—।'

মনে-মনে রাগ হলেও আমি নিরুপায়। বললাম, 'ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে আছে,' বলে ওর পেছনে আঙুল নিয়ে দেখালাম। লোকটি ড্রেসিং টেবিলের

দিকে তাকাল।

ব্যস, ওই একটি মুহূর্তই যথেষ্ট ছিল আমার কাছে। একটুও দেরি না করে টেবিলের ভাঙা পায়াটা তুলে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে সর্বশক্তি দিয়ে বসিয়ে দিলাম ওর চোয়ালে। ফট করে একটা শব্দ হল। সঙ্গে-সঙ্গে অতবড় দেহটা সটান পড়ে গেল মেঝেতে।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকালাম। লোকটি ঢুকল কোথা দিয়ে! ভালো করে দেখেশুনেও কোনও দরজা খোলা দেখলাম না। তবে কি জানলা দিয়ে ঢুকেছে! এই ভেবে এগিয়ে গেলাম জানলার কাছে।

দূরে হোটেলের কার পার্কের সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখেই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে একটা গাড়িতে উঠে গাড়ি চালিয়ে দিল। এও কি লালপাঞ্জার কমরেড নাকি? রহস্যের জট ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে দেখছি!

প্রথম থেকে ভাবতে লাগলাম ঘটনাগুলো।

ঘটনার শুরু সেইদিন থেকে, যেদিন অশোকের সঙ্গে আমার দেখা হয় কলকাতায়—একরকম হঠাৎই বলতে হবে।

নিত্তনৈমিত্তিক একঘেয়ে জীবন থেকে কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তি পাওয়ার আশায় সন্ধের সময় গিয়েছিলাম ময়দানে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎই দেখা হয়েছিল অশোকের সঙ্গে। অশোক বোস—আমার স্কুলের বন্ধু ছিল ও।

'আরে, কাঞ্চন না!'

'চণ্ডাশোক নিশ্চয়ই!' আমিও কম অবাক হইনি।

'হ্যাঁ। তা কী করছিস এখন?'

'এই দেশভ্রমণ বলতে পারিস—' হালকা সুরে জবাব দিয়েছিলাম।

'আচ্ছা, কাঞ্চন, আমার একটা কাজ করে দিবি?'

একটু আশ্চর্য হয়ে বলি, 'কী কাজ?'

'খুবই সামান্য—একটা ম্যানাস্ক্রিপ্ট একজন প্রকাশকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।'

'তা সেটা আমাকে করতে বলছিস কেন?' জানতে চাইলাম আমি।

'দেখ, তোকে খুলেই বলি,' বলল অশোক, 'তুই নিশ্চয়ই সিরাজনগর স্টেটের নাম শুনেছিস?'

'হ্যাঁ—শুনেছি।' না শুনলেও বললাম আমি।

'সেই সিরাজনগরের রাজা ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব রায়। তিনি সিনেমার এক হিরোইনকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল সুলক্ষণা সেন। পরে সিরাজনগরের বিপ্লবীরা বিপ্লবের সময় রাজা-রানীকে খুন করে। শোনা যায় এর পেছনে নাকি লালপাঞ্জা নামে একটা দলের হাত ছিল। রাণী সুলক্ষণা অভিনেত্রী ছিলেন বলে

তাঁর ওপর বিপ্লবীদের রাগ বোধহয় বেশি ছিল। তাঁকে ওরা এমনভাবে পিটিয়ে মেরেছিল যে, রাজবাড়ির সিঁড়ির ওপর শুধু এক তাল মাংসপিণ্ড পড়ে ছিল। এরপর শুদ্ধসত্ত্ব রায়ের প্রথম পক্ষের ছেলে অতলান্ত রায় রাজা হন। রাণী সুলক্ষণার ব্যাপারটা তিনি জানতেন না। রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়ার সময় রাণীর মৃত্যুর খবর পান তিনি। কিন্তু কিছুদিন পর গুপ্তঘাতকের ভয়ে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। পরে শোনা যায় যে, তিনি নাকি নেপালে এক অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। কিছুদিন পর অবস্থা শান্ত হলে রণজিৎ সেন রাজ্যের দায়িত্ব নেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠায় তিনি অর্থ সাহায্যের জন্যে দু-একটি প্রদেশের কাছে গোপনে আবেদন জানান।'

'কিন্তু এর মধ্যে পাণ্ডুলিপিটা আসছে কোত্থেকে?' এতক্ষণ পর অধৈর্য হয়ে উঠি আমি।

'আসছে—আসছে। একটু ধৈর্য ধরে শোন,' বলে অশোক আবার শুরু করল, 'তুই নিশ্চয়ই সুরেন্দ্র পালিতের নাম শুনেছিস?' আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ও বলে চলল, 'সুরেন্দ্র পালিত ছিলেন সিরাজনগরের রাজা শুদ্ধসত্ত্বর মুখ্য প্রতিনিধি। এই দিনসাতেক হল তিনি মারা গেছেন। এই পালিতসাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল একটু বিচিত্রভাবে। সে আজ প্রায় বছরদুয়েক আগের কথা। সিরাজনগরে আমি গিয়েছিলাম অফিসের কাজে—সেল্‌স রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে। একদিন রাতে একটা অন্ধকার গলিতে দেখি দুটো লোক একজন বৃদ্ধ লোকের ওপর চড়াও হয়েছে। রাস্তায় আর লোকজন ছিল না। আমি ছুটে গিয়ে ওদের ওপর পড়ি। তারপর আমার সেই পুরনো অভিজ্ঞতা সামান্য পরিমাণে অবোধ শিশুদুটোকে দান করলাম।' বলে প্রাক্তন জেলা বক্সিং চ্যাম্পিয়ান অশোক হাতের মাসল ফুলিয়ে দেখাল। আমরা একসঙ্গেই বক্সিং শিখতাম।

বললাম, 'তারপর—?'

'তারপর আর কী, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি আজ কার জীবনরক্ষা করলেন? আমি বললাম, না—আমি এখানে নতুন এসেছি। তিনি বললেন, আমার নাম সুরেন্দ্র পালিত। ...চমকে উঠলাম আমি। কারণ ওই ভদ্রলোক সম্পর্কে কানাঘুষোয় অনেক কথাই শুনেছিলাম। শুনেছিলাম সুরেন্দ্র পালিতই নাকি রাজা শুদ্ধসত্ত্বের পেছনে বসে সবকিছুর কলকাঠি নাড়তেন। যাকগে, তিনি বললেন, আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ—আমার মনে থাকবে। এরপর তিনি আমার নাম-ঠিকানা নিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

'এতদিন পর হঠাৎ সেদিন—এই দিনদশেক আগে তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খবরের কাগজেই দেখেছিলাম, তিনি কলকাতায় আছেন। গ্রেট

ইস্টার্ন হোটেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি তখন ভীষণরকম অসুস্থ। আমাকে দেখে বললেন, মিস্টার বোস, আপনার ওপর আমি খুব বড় একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে যেতে চাই। সিরাজনগরের রাজনীতির সমস্তরকম খেলারই সাক্ষী ছিলাম আমি। প্রচুর গুপ্তকথাও জানতে পেরেছিলাম। আমি আজ আমার স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপিটা আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। আপনি দিল্লি যাবেন। সেখানে এক পাবলিশার আছে—মেহেতা অ্যান্ড সন্স। তাদের হাতে আপনি এই পাণ্ডুলিপিটা সামনের মাসের মধ্যে তুলে দিলে তারা আপনাকে পনেরো হাজার টাকা দেবে। এইরকমই কথা আছে। আপনি না করবেন না, মিস্টার বোস। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতা শোধ দেওয়ার এই আমার শেষ সুযোগ। আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না। কথা দিন আপনি।

'আমি কথা দিয়েছিলাম। তখন তিনি আমাকে একটা মোটা পাণ্ডুলিপি দেন। আমি সেটা নিয়ে আমার কাছে রাখি। কিন্তু তারপর থেকে একদম সময় করে উঠতে পারছি না। এর ওপর পরশুদিনই অফিসের কাজে একবার রাজস্থান যেতে হবে। এখন তুই এই কাজের ভারটা নিতে পারিস। পনেরোর মধ্যে পাঁচ হাজার তুই নিস, আর আমাকে বাকিটা দিয়ে দিস—রাজি?' অশোক হাসিমুখে তাকাল আমার দিকে।

অশোকের কথাগুলোর মধ্যে কেমন একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছিলাম। তাই সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম, বললাম, 'আপত্তির কী আছে! কিন্তু রণজিৎ সেন এখন কোথায়, দিল্লিতে?'

'ঠিকই ধরেছিস,' বলল অশোক, 'সেখানে কুমার রণজিৎ কয়েকজন বিরাট বিজনেস ম্যাগনেটের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন, রাজ্যের অর্থসঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্যে। কয়েকজন বিজনেসম্যান সিরাজনগরে তেলের কোম্পানি খোলার জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই ব্যাপারেই রফা করে একটা চুক্তি হবে আর কী। ও চায় তেল, আর এ চায় টাকা।' বলে অশোক হাসল।

'আচ্ছা, অশোক, রণজিৎ সেন শুদ্ধসত্ত্ব রায়ের ঠিক কীরকম রিলেটিভ হন?'

'কুমার রণজিৎ শুদ্ধসত্ত্ব রায়ের শ্যালক। ওহ্-হো, আর-একটা কথা তোকে বলতেই ভুলে যাচ্ছিলাম, কাঞ্চন। আমার কাছে কতকগুলো চিঠি আছে। আশ্চর্যভাবেই পেয়েছিলাম ওগুলো। একবার একজন নেপালীকে আমি খুব রিস্ক নিয়ে একটা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচিয়েছিলাম। কৃতজ্ঞতায় সে একটা চিঠির বাণ্ডিল আমাকে দিয়েছিল—।'

হেসে বাধা দিলাম আমি : 'মাইরি, একটা বই লেখ তুই, যাহাদের আমি প্রাণরক্ষা করিয়াছি—।'

'শোনই না আগে! লোকটি আমাকে যা বলল, তা হল যে, ওই চিঠিগুলো

সে একটি লোকের কাছ থেকে পায়। লোকটির পকেটে সে নাকি একটা লালপাঞ্জার ছাপওয়ালা কাগজ দেখতে পায়। লোকটি গুরুতর অসুস্থ ছিল। সে মারা যাওয়ার আগে শুধু বলেছিল, ভীষণ দামী চিঠি এগুলো। তাই সে কৃতজ্ঞতায় এগুলো আমাকে দিচ্ছে। যা হোক, পরে আমি এক আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করি যে, পাণ্ডুলিপির হাতের লেখা আর চিঠির হাতের লেখা একেবারে এক। তবে কি সুরেন্দ্র পালিতই চিঠিগুলো লিখেছেন? কিন্তু চিঠির নীচে সই আছে দিল্লির কোনও এক মিসেস সুচরিতা চৌধুরীর। অনেকগুলো চিঠি—আমি আর পড়ে দেখিনি। ওগুলোও তুই নিয়ে আমাকে রেহাই দিস। আর পারলে ওই সুচরিতা চৌধুরীকে চিঠিগুলো ফেরত দিয়ে দিস।'

এরপর আমি অশোকের সঙ্গে গিয়ে পাণ্ডুলিপি আর চিঠি নিয়ে অশোকেরই বুক-করা এয়ার টিকেটে দিল্লি রওনা হই। তা এই অতি সামান্য কাজের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা বা মন্দ কী? কিন্তু তখন কি জানতাম, কী সাঙ্ঘাতিক বিপদ হায়নার মতো হাঁ করে বসে রয়েছে আমারই জন্যে—দিল্লিতেই!

ঘরের জানলা দিয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল সুচরিতা চৌধুরী। এ-জীবন আর ভালো লাগছে না। ওর মনে পড়ছিল সিরাজনগরের দিনগুলোর কথা। সেখানে সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক ছিল অমিত—অমিত চৌধুরী। ওর কথা মনে পড়লে মাঝে-মাঝে এই পোড়া মনটা বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। হয়তো এ-কথা সত্যি যে, অমিত সুচরিতাকে ভালোবাসেনি—যন্ত্র হিসেবেই দেখেছে চিরকাল। অথচ কী যে হয়েছিল ওই আঠেরো বছর বয়েসটায়! সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে অমিতকেই হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়েছিল ও। বিয়ের পর স্বামীর জন্য সবরকম কাজই করেছে। উঃ—সেই বিপ্লবের রক্তাক্ত দিনগুলো, যেদিন শেষবারের মতো আর্তনাদ করে উঠেছিল অমিত। ওর মনে পড়ল লালপাঞ্জা দলের কথা। আজ পর্যন্ত ও সে-দলের কাউকেই দেখেনি। তবে একটা কাগজ দেখেছিল অমিতের কাছে—তাতে একটা পাঞ্জার ছাপ ছিল—লাল রঙের। সেটা নিশ্চিত বিপদের ইশারা বয়ে এনেছিল।

অমিতের মৃত্যুর পর যখন ও সিরাজনগর ছেড়ে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য দিল্লির দিকে পা বাড়িয়েছিল, সেইসময় ওকে রণজিৎ সেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন। অমিত চৌধুরীর একনিষ্ঠ সাহায্যের প্রতিদান দিতে তিনি যে অক্ষম সে-কথাই জানিয়েছিলেন বারবার করে। সুচরিতা লজ্জা পেয়েছিল। এর পরই ও দিল্লিতে চলে আসে। টাকার অভাব ওর ছিল না—এখনও নেই। কিন্তু একটা ব্যাপারে ও ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছে।

এই প্রসঙ্গেই ওর মনে পড়ল সুরেন্দ্র পালিতের কথা। তাঁর স্মৃতিকথা লেখার ব্যাপারটা। ম্যানাস্ক্রিপ্টের কথা। হেন ব্যাপার বোধহয় ছিল না, যা সুরেন্দ্র পালিত না জানতেন। এখন যদি ম্যানাস্ক্রিপ্টটা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়, তা হলে! তা হলে যে সর্বনাশ হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কুমার রণজিৎ একেবারে অথৈ জলে পড়বেন, অথৈ জলে পড়বে লালপাঞ্জা দলের কমরেডরাও। আর—হ্যাঁ, আর অসুবিধেয় পড়বে সমর বর্মন। তবে সবচেয়ে বেশি অসুবিধেয় পড়বে সিরাজনগর।

সমর বর্মনকে নিজের লাইনে শিল্পী বলা যেতে পারে। লোকটার সঙ্গে সুচরিতার সামনাসামনি পরিচয় নেই, কিন্তু তার সম্বন্ধে এত কথা শুনেছে যে, তার চরিত্র সুচরিতার কাছে একটুও অচেনা নয়। লোকটা বহুবার প্রমাণ করেছে চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা। এরকম নিখুঁত টাইপের হীরে চোর ও ব্ল্যাকমেলার কেউ বোধহয় কোনওদিন দেখেনি। সুরেন্দ্র পালিত বহুবার সমর বর্মনকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। অনেক চেষ্টার পর সফলও হয়েছিলেন। সমর বর্মন জেলে গিয়েছিল তিন বছরের জন্য।

কিন্তু এখন? হ্যাঁ, এর মধ্যে তার মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়ে সে বোধহয় ছাড়া পেয়ে গেছে। এই বর্মন লোকটা ছদ্মবেশ নিতে এত ওস্তাদ যে, ধারণার বাইরে। এককথায়, সমর বর্মন তার লাইনে সম্রাট। সে যখন সুরেন্দ্র পালিতের হাতে ধরা পড়েছিল তখন সুরেন্দ্র পালিত নিশ্চয়ই তাঁর স্মৃতিকথায় বর্মন সম্পর্কে অনেক কথাই লিখে গিয়েছেন, যা পুলিশ জানতে পারলে বর্মন মুশকিলে পড়বে।

সিরাজনগর যে মুশকিলে পড়বে তারও কারণ আছে। কারণ, কুমার রণজিতের আর্থিক অনটনের কথা বাইরের কেউই বিশেষ জানেন না। জানলে কুমার রণজিৎ সারা ভারতের কাছে ছোট হয়ে যাবেন। কিন্তু সুরেন্দ্র পালিত যদি এই সব ব্যাপারে খোলসা করে লিখে গিয়ে থাকেন ওই পাণ্ডুলিপিতে? নাঃ, পরের ব্যাপার আর ভাবতে পারছে না সুচরিতা। এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, সত্যিই সাঙ্ঘাতিক।

আবার অমিতের কথা মনে পড়ল সুচরিতার। ভালোবাসা কথাটার প্রকৃত সংজ্ঞা সুচরিতা জানে না। অনেকেই এখন ওকে পাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সুচরিতা তাতে হেসেছে। যদিও অত্যন্ত স্বাভাবিক এই ব্যাপারটা। কারণ ওর তিরিশ বছরের সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব, কটাক্ষ, চেহারা ইত্যাদিকে অবহেলা করা কোনও পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এখনও কোনও-কোনও বিজ্ঞাপনের কাজে সুচরিতা নিজের 'অমূল্য' সময় খরচ করে। নামকরা সিনেমার কাগজেও ওর ছবি মাঝে-মাঝে ছাপা হয়। তবু একটা কিছুর অভাব যেন ও বুঝতে পারে।

এমন সময় ফ্ল্যাটের বেল বেজে উঠল। চটপট উঠে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল

সুচরিতা।

দরজায় মৃদু হাসি মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ সান্যাল। ছিপছিপে চেহারার যুবক। চেহারায় একটা আকর্ষণ আছে। বয়স সুচরিতার চেয়ে কমই। আটাশ কি ঊনতিরিশ। তবু ছেলেটা ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চায়। সত্যি, কী বিচিত্র!

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে তরুণ বলল, 'সুচরিতা, একটা জরুরি খবর নিয়ে এসেছি। মানেকজী পাঠিয়েছেন আমাকে—বুঝতেই তো পারছ।'

দরজা বন্ধ করে সুচরিতা এসে চেয়ারে বসল। বলল, 'কী জরুরি খবর, শুনি?'

'মানেকজী আমাকে আজ সকালে বললেন, তোমাকে ফোন করে একটা খবর দিতে। আমি ফট করে বলে দিলাম তোমার ফোন খারাপ আছে, যাতে তোমার সঙ্গে অন্তত দেখাটা হয়। তখন তিনি আমাকে পাঠালেন কুরিয়ার হিসেবে।'

তরুণ সান্যাল 'মানেকজী-প্রসাদজী' ফার্মের পার্টনার মানেকজীর প্রাইভেট সেক্রেটারি। সারাদিনে বেচারা একদম ছুটি পায় না, খালি ডিক্টেশান আর টাইপ।

'রাবিশ—' বিরক্ত গলায় বলল তরুণ, 'আমার আর ভালো লাগছে না, সুচরিতা।'

'কেন, বেশ তো আছ—। যাকগে। জরুরি কথাটা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়?' মুচকি হেসে জানতে চাইল সুচরিতা। ও জানে তরুণ সান্যাল বোকা নয়।

'তা, মোটামুটি জানি বইকী।' ইতস্তত করে বলল তরুণ, 'তুমি বরং মানেকজীর কাছ থেকেই শুনে নিয়ো।'

'তরুণ!' ঈষৎ ভর্ৎসনা, কটাক্ষ, চোখের ইশারা—ব্যস ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল তরুণের পক্ষে। গড়গড় করে বিগতিলকণ্ঠে বলতে শুরু করল তরুণ, 'সুচরিতা, ব্যাপারটা সিরাজনগরের সঙ্গে, সুরেন্দ্র পালিতের সঙ্গে কানেক্টেড। অশোক বোস নামে এক ভদ্রলোক দিল্লি আসছেন আগামীকাল। সুরেন্দ্র পালিতের স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপিটা তাঁর কাছেই আছে। তিনি সেটা এখানকার কোনও এক পাবলিশারের কাছে পৌঁছে দেবেন। তুমি তো বুঝতেই পারছ—ওই পাণ্ডুলিপি এখন ছেপে বেরোলে সর্বনাশ হবে। সেইজন্যেই মানেকজী আর প্রসাদজী খুব আপসেট হয়ে পড়েছেন। তোমার মনে আছে, গত বছর মিস্টার পালিত একবার "কবুতর"-এ এসেছিলেন, কিছু গোপন ব্যাপার আলোচনা করার জন্যে?'

'হ্যাঁ—মনে আছে।' উত্তর দিল সুচরিতা।

কবুতর। প্রসাদজীর বাগানবাড়ি। শহরতলিতে বিরাট জায়গা নিয়ে তৈরি এই কবুতর। মাঝে-মাঝে গোপন মিটিং থাকলে প্রসাদজী ওই কবুতরকেই ব্যবহার করেন। এবারও সেই তেলের ব্যাপারটা, টাকার ব্যাপারটা, আলোচনার জন্য একটা ঘরোয়া মিটিং ডাকা হয়েছে ওই কবুতরে।

'এবারের মিটিংয়ের আলোচনার বিষয় কিন্তু অন্য। কুমার রণজিতও আসছেন। মানেকজী তোমাকেও ওই মিটিং-এ থাকতে বলেছেন। আর...।'

তরুণকে ইতস্তত করতে দেখে সুচরিতা হাসল, বলল, 'শ্রীঅশোক বোসও আশা করি ওই মিটিং-এ আসছেন!'

'না, এখনও বোধহয় তাঁকে বলা হয়নি। আগামীকাল তিনি এসে হোটেল কন্টিনেন্টালে উঠছেন। তারপর নিশ্চয়ই বলা হবে—।'

'ও, এবার বুঝেছি,' ব্যঙ্গের হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে সুচরিতা বলল, 'তা হলে কবুতরে গিয়ে আমাকে ওই ভদ্রলোককে কবজা করতে হবে, যাতে তিনি আমার ছলাকলায় মুগ্ধ হয়ে ওই ম্যানাস্ক্রিপ্ট পাবলিশারের কাছে না দেন!'

'বুঝতেই তো পারছ, সুচরিতা। এতে তোমারও স্বার্থ আছে। তুমি কি চাও যে, ওই ম্যানাস্ক্রিপ্ট ছেপে বেরোক?'

'দ্যাখো তরুণ, সত্যি কথা বলতে গেলে আমি তা চাই না। কিন্তু তা বলে—' মনের দ্বিধাকে কাটিয়ে উঠতে পারল না সুচরিতা, বলল, 'যাকগে, আমি সোজাসুজি মানেকজীকেই আমার মত জানাব।'

'আচ্ছা, সুচরিতা, একটা কাজ করলে হয় না?'

'কী?' অবাক হয়ে তরুণের মুখের দিকে তাকাল সুচরিতা। পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে তরুণ বোধহয় নতুন কিছু বলবে।

'চলো না, আমরা দুজন একটু বেড়িয়ে আসি। মানেকজীকে গিয়ে বললেই হবে যে, আমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

'না, তরুণ, আমার ঠিক মুড নেই। তা ছাড়া সময় কোথায়!'

'হুঁ, সময় তোমার আর কোনওদিনই হবে না। কবে তোমার মত পালটাবে বলতে পারো, সুচরিতা!'

'আচ্ছা, তরুণ, গতকাল চাঁদনী চকের কাছে তোমাকে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখলাম...ওই মেয়েটি কে?'

মুহূর্তের মধ্যে তরুণ স্যান্যালের মুখের রং পালটে গেল। আমতা-আমতা করে বলল, 'ও কিছু নয়। তুমি কি জানো না সুচরিতা, ভালো আমি তোমাকেই বাসি!'

মনে-মনে হাসল সুচরিতা। এ ধরনের লোকদের দেখলে ওর রাগ হয়। এইজন্যই আজকাল ওর আর কিছুই ভালো লাগছে না। চারপাশে সব স্তাবকের

দল স্বার্থসিদ্ধির জন্য দিনরাত প্রশংসা করে চলেছে। উঃ—! মুখে বলল, 'তরুণ, তুমি এখন যাও। আমাকে একটুখানি একা থাকতে দাও—।'

তারপর শোওয়ার ঘরের দিকে পা বাড়াল ও।

তরুণ সান্যাল হতাশভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেল।

সুচরিতা শুয়ে-শুয়ে ভাবছিল অমিতের কথা। সুরেন্দ্র পালিতের পাণ্ডুলিপি যদি ছাপা হয় তবে কি ও বিপদে পড়বে? অথবা অমিত চৌধুরীর চরিত্রে দাগ পড়বে? না, কিছু ভাবতে পারছে না সুচরিতা। এ ছাড়াও কানাঘুষোয় ও আঁচ পেয়েছে যে, সমর বর্মন নাকি ওইদিনের মিটিংয়ে হাজির থাকছে। কারণ? কারণটা ঠিক পুরোপুরি জানে না সুচরিতা। তবে শুনেছিল যে, গত বছরের মিটিংয়ে সুরেন্দ্র পালিত অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন। রাণী সুলক্ষণার গলায় যে-হীরের নেকলেস ছিল, সেটা কোনওরকমে সরিয়ে সুরেন্দ্র পালিত এতদূরে এসে এই কবুতরেই লুকিয়ে রেখেছিলেন—ওই মিটিংয়ের দিনই। অথচ সেই নেকলেস চুরির দায় চাপিয়ে দিয়েছিলেন সমর বর্মনের ঘাড়ে। সত্যিই—সাংঘাতিক কূটবুদ্ধির লোক ছিলেন এই সুরেন্দ্র পালিত।

সুরেন্দ্র পালিত চলে যাওয়ার কিছুদিন পর কবুতরের মালী লাইব্রেরি-ঘরে একজন লোকের মৃতদেহ পায়। মৃত লোকটির পকেটে লালপাঞ্জা দলের প্রতীক-চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। তার মানে হীরের নেকলেসটার কথা সবাই জানে। আগামী মিটিংয়ে বর্মন যদি কারও ছদ্মবেশে আসে—তবে? নাঃ—এই অশোক বোস নামের ভদ্রলোকটির সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। এবং কালই—।

লোকটির অচেতন দেহটা নিয়ে কী করব তাই ভাবছিলাম, এমন সময় ঘরে ঢুকল ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম হোটেল কন্টিনেন্টালের বেয়ারা। ও-ই আমার ঘর অ্যাটেন্ড করে। ও ঘরে ঢুকে অত্যন্ত অবাক হয়ে গেল, বলল, 'স্যার—এ কী কাণ্ড!'

আমি কেটে যাওয়া ঠোঁটের কোনাটা রুমাল দিয়ে মুছে নিচ্ছিলাম, বললাম, 'তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে। আমি আর-একটু হলেই একে জানলা দিয়ে ফেলে দিতাম। একে নিয়ে গিয়ে হোটেলের বাইরে ছুড়ে ফেলে দাও।'

ইব্রাহিম চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে লোকটির উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটিকে চিৎ করে দিল। আমি আয়নায় দেখছিলাম কতখানি আহত

হয়েছি। হঠাৎ আয়নাতেই লক্ষ করলাম, ইব্রাহিম লোকটিকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছে। কে জানে! হয়তো আমার দেখার ভুল।

একটু পরেই লোকটিকে কোথায় যেন রেখে ইব্রাহিম আমার ঘরে ফিরে এল। এসে ঘর পরিষ্কার করতে শুরু করল। ঘর সাফসুতরো হয়ে গেলে ওকে পাঁচটা টাকা দিলাম। ও চলে গেল।

হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। সন্ধে ছ'টা। দারুণ কৌতূহল হচ্ছে ওই পাণ্ডুলিপি আর চিঠিগুলো নিয়ে। আজ পড়ব, কাল পড়ব, করেও সময় করে উঠতে পারিনি। এখন হাতমুখ ধুয়ে দরজা বন্ধ করে সুটকেশ খুললাম। দুটো প্যাকেটই বের করলাম।

প্রথমে চিঠির বাণ্ডিলটা ধরলাম। দু-একটা চিঠি উলটেপালটে দেখলাম। নিছকই প্রেমপত্র। আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে ভরা। লেখিকা মিসেস সুচরিতা চৌধুরী। আর চিঠির ওপরে কোনও নাম উল্লেখ করে সম্বোধন নেই। শুধু 'মাই ডিয়ার' দিয়ে শুরু। তবে একটা বিশেষ চিঠির মধ্যে একটা বাড়ির নামের উল্লেখ করা হয়েছে। কবুতর থেকে চিঠিটা লেখা হয়েছে। আর চিঠির ওপরে দিল্লি শব্দটি লেখা আছে। তার মানে দিল্লিরই কবুতর নামের কোনও বাড়ি থেকে চিঠিটা লেখা। কেউ কি এই চিঠিগুলো নিয়ে সুচরিতা চৌধুরীকে ব্ল্যাকমেল করছিল? সেইজন্যেই কি এগুলো দামী বলেছিল নেপালীটি? যাকগে, যার চিঠি তার দেখা যদি পাই তবে এ-ভার থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। বলা যায় না, ভদ্রমহিলা হয়তো আতঙ্কে পাগল হয়ে নিশিদিন কোনও ব্ল্যাকমেলারের অপেক্ষা করছেন।

চিঠিগুলো রেখে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে পড়লাম।

প্রথম থেকে পড়তে শুরু করলাম।

সাধারণ ধরনের স্মৃতিকথা। সিরাজনগর সম্বন্ধে নানান তথ্য লেখা। পড়তে-পড়তে এক জায়গায় সমর বর্মনের কথা পেলাম। পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে, 'মানুষ ছদ্মবেশ নিয়ে সর্বাঙ্গে পরিবর্তন আনতে পারে, কিন্তু কানের পরিবর্তন করা অসম্ভব...।' তার মানে সমর বর্মনের কানে কি কোনও বিশেষত্ব আছে? নাকি এটা নিছক কল্পনা?

পাণ্ডুলিপিটা প্রায় ঘণ্টাদুয়েক পর শেষ করলাম। এমন সময় ঘরের দরজায় নক করার শব্দ শোনা গেল। পাণ্ডুলিপি আর চিঠির বাণ্ডিলটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে উঠে গিয়ে দরজা খুললাম।

দেখি ইব্রাহিম দাঁড়িয়ে। ওর হাতের ট্রেতে সাজানো ডিনার।

ও ট্রেটা এনে টেবিলের ওপর রাখল। হঠাৎ লক্ষ করলাম, ওর চোখের দৃষ্টি ড্রেসিং টেবিলের ওপর।

আমার দেখার ভুল?

ও খাবার রেখে ঘর ছেড়ে চলে গেল। তা হলে কি—তা হলে কি...?

খাওয়া-দাওয়া সেরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। অবশ্য তার আগে চিঠির বাণ্ডিলটা সুটকেশে বন্ধ করে রাখলাম। আর পাণ্ডুলিপিটা বালিশের নীচে রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনেক রাতে ঘরের ভেতরে কারও চলাফেরার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। সামান্য চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি ঘরের জানলাটা নেই। শুনতে অবাক লাগলেও ঠিক তাই। জানলার জায়গাটা জমাট অন্ধকারে ঢাকা। হঠাৎ সেই জমাট অন্ধকারটা নড়ে উঠল। জানলাটা আবার দেখা গেল।

ছায়ামূর্তিটা ক্রমশ ড্রেসিংটেবিলের দিকে এগোতে লাগল। আমি চুপিচুপি উঠে গিয়ে একলাফে ঘরের বাতিটা জ্বেলে দিলাম। যে-লোকটি হতভম্ব হয়ে চমকে ফিরে তাকাল, তার হাতে একটা ছুরি ঝিকিয়ে উঠল। লোকটি আর কেউ নয়, স্বয়ং ইব্রাহিম!

আমাকে আলো জ্বালতে দেখেই ও তীরবেগে আমার দিকে ছুটে এল। আমার চোখ ছিল ওর হাতের দিকে। নিমেষের মধ্যে দু-হাতে ওর ডানহাতের কবজি চেপে ধরলাম। দুজনেই মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম। আমার ঝাঁকুনিতে ইব্রাহিমের হাতের ছুরি পড়ে গেল মাটিতে। তারপর কেন জানি না ও হঠাৎই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ল জানলার দিকে। এবং মুহূর্তের মধ্যেই জানলা-পথে সটকে পড়ল।

ইব্রাহিমের পিছু নিয়ে লাভ নেই জেনে সে-চেষ্টা আর করলাম না। এগিয়ে এসে ছুরিটা তুলে নিলাম। সাধারণ ছুরি একটা, কিন্তু বাঁটের ওপর একটা হাতের পাঞ্জা খোদাই করে আঁকা। এখানেও লালপাঞ্জা! ইব্রাহিমও লালপাঞ্জা দলের কমরেড? তাই হয়তো গত বিকেলের অচেতন লোকটিকে দেখে ও একটু অবাক হয়েছিল।

তাড়াতাড়ি গিয়ে সুটকেশটা খুললাম। সর্বনাশ! চিঠির বাণ্ডিলটা অদৃশ্য হয়েছে। তবু ভালো যে, পাণ্ডুলিপিটা বালিশের নীচে রেখে শুয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ পর আবার আলো নিভিয়ে জানলা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই রাতে চেঁচামেচি করেও কোনও ফল হবে না। কারণ, ইব্রাহিম নিশ্চয়ই আর কন্টিনেন্টালের চত্বরে বসে নেই!

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠেই প্রথমে গেলাম ম্যানেজারের ঘরে।

আমাকে দেখেই তিনি বললেন, 'মিস্টার বোস, (অশোকের নামেই হোটেলে

ঘর বুক করেছিলাম আমি) শুনলাম আপনার ঘরে নাকি গত রাতে চোর এসেছিল।'

আমি বললাম, 'না তো! ইব্রাহিম কী একটা জরুরি খবর দিতে ভুলে গিয়েছিল বলে রাত দুটোর সময় খবরটা দিতে একবার এসেছিল।'

'কী খবর? কী খবর?' ব্যগ্র হয়ে উঠলেন ম্যানেজার।

'ইব্রাহিমের শাদির নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। যাওয়ার সময় ও তাড়াতাড়িতে ওর ছুরিটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। আপনি কাইন্ডলি ওকে এটা দিয়ে দেবেন।' বলে পাশপকেট থেকে ইব্রাহিমের অস্ত্রটা বের করে ম্যানেজারসাহেবকে দিলাম।

'এটা যে সত্যি-সত্যিই একটা ছুরি দেখছি!' আঁতকে উঠলেন ম্যানেজার।

'না, দাঁত খোঁচানোর কাঠি—' মনে-মনে বললাম আমি, মুখে বললাম, 'ইব্রাহিম আশা করি হোটেলে আর নেই।'

'না, পালিয়েছে।' সঙ্গে-সঙ্গেই জানালেন তিনি।

'চুরি অবশ্য তেমন কিছু যায়নি। তবু খবরটা দিয়ে রাখা ভালো,' বললাম আমি, 'এক বাণ্ডিল চিঠি নিয়ে গেছে ইব্রাহিম। বোধহয় নামকরা কোনও লোকের নিজের হাতে লেখা এক অমূল্য পাণ্ডুলিপি মনে করেছে ওটাকে। বিবিকে শাদিতে উপহার দেবে বোধহয়।' চেয়ার ঠেলে উঠলাম আমি।

এমন সময় ম্যানেজার আমতা-আমতা করে প্রশ্ন করলেন, 'মিস্টার বোস, আপনি কি আমাদের হোটেলে আর থাকবেন?'

'তার মানে!' যেতে গিয়েও ঘুরে তাকালাম আমি।

'না, এরকম একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল...।'

'ওঃ—' হেসে ফেললাম আমি: 'আপনিশুদ্ধু সবকটা বেয়ারাও যদি আমার ঘরে চুরি করতে ঢোকেন, তবু আমি এ-হোটেল ছাড়ছি না, আন্ডারস্ট্যান্ড?'

ম্যানেজারকে উত্তর দেওয়ার কোনও সুযোগ না দিয়েই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

ওপরে ঘরে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সবে শেষ করেছি, এমন সময় ফোন বেজে উঠল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রিসিভার তুলে নিলাম।

'হ্যালো—'

'স্যার,' ডেস্ক ক্লার্কের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

'কী নাম?' অবাক হয়ে জানতে চাইলাম আমি।

'মিস্টার...।' মিনিটখানেক নীরবতার পর আবার গলা শোনা গেল, 'স্যার, আমি ভদ্রলোকের কার্ড আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ফোন নামিয়ে রাখার একটু পরেই দরজায় নক করার শব্দ পেলাম। দরজা খুলতেই একজন বেয়ারা একটা কার্ড দিল আমার হাতে। তাতে লেখা :

শ্রীনরসিংহ দত্তরায় সেন চৌধুরী

বার-অ্যাট-ল

ডেস্ক ক্লার্কের নীরবতার কারণ এখন বুঝতে পারলাম। যা হোক, মনে-মনে নরসিংহবাবুর বাবাকে ছেলের নামকরণের জন্যে কয়েক হাজার ধন্যবাদ জানিয়ে বেয়ারাটিকে বললাম, 'বাবুকে ডেকে দাও—আমি দেখা করব।'

একটু পরেই ঘরে যিনি প্রবেশ করলেন তাঁকে এক কথায় জলহস্তীর ছানা বলা যায়। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আসুন, আসুন—।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে তিনি বললেন, 'আমার নাম—।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাধা দিলাম আমি : 'প্লিজ, আর বলার প্রয়োজন নেই—।' কার্ড পড়েই মাথা ঘুরছে। তার ওপর আবার বললে হয়তো হার্টফেল করব।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন, বললেন, 'যদি ভুল না আমার হয়ে থাকে, তবে বোধহয় অশোক বোস আপনিই?'

আমি মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। বললাম, 'আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না—।'

'লয়ালিস্টদের তরফ থেকে আমি আসছি। আপনার কাছে সুরেন্দ্র পালিতের শুনেছি স্মৃতিকথার ম্যানাস্ক্রিপ্টটা আছে।'

'ঠিকই শুনেছেন—।' জানালাম আমি। ওঁর কথা বলার ভঙ্গিতে ক্রমশ অবাক হচ্ছিলাম।

'চাই না আমরা যে, পাণ্ডুলিপিটা ছাপা এখন হোক। কুমার রণজিতও চাইবেন না সেটা। আপনি আশা করি রাখবেন কথা আমাদের এবং প্রকাশ এখন পাণ্ডুলিপিটা করবেন না।'

'মোটেই না—মোটেই না। বরং আজকালের মধ্যেই আমি মেহেতা অ্যান্ড সন্সের হাতে পাণ্ডুলিপিটা তুলে দিচ্ছি।' নির্বিকারভাবে জানালাম আমি।

'করতে এটা পারেন না আপনি। এতে বিপদ অনেক হবে।'

'আমি কথা দিয়েছি—।'

'আপনি তা হলে শুনবেন না অনুরোধ আমাদের? এই শেষ কথা আপনার তা হলে?'

'আমি নিরুপায়—।'

'বেশ,' উঠে দাঁড়ালেন শ্রীনরসিংহ : 'জানি অন্য আমরা উপায়। আমরা

এটা ছাপানোর ব্যাপারটা করবই যেভাবে হোক বন্ধ। নমস্কার—।'

শ্রীনরসিংহ থপথপ করে বিদায় নিলেন।

আমি চিন্তার পড়ে গেলাম। অন্য উপায় মানে! ইব্রাহিমের মতোই কাউকে তিনি ব্যবহার করবেন নাকি!

প্রায় ঘণ্টাখানেক ডুবে রইলাম নানান চিন্তায়।

হঠাৎই সমস্ত চিন্তা ছিন্নভিন্ন করে ফোন বেজে উঠল।

চিন্তিত হলাম। এ আবার কে ফোন করল! এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম।

'হ্যালো—।'

'মিস্টার অশোক বোস?'

'আপনি?'

'মেহেতা অ্যান্ড সন্সের শ্রীজগদীশকিশোর মেহেতা।'

'ও—কী ব্যাপার?' ভীষণ অবাক হলাম আমি।

'মিস্টার বোস, ম্যানাস্ক্রিপ্টটা কি আপনি আজ দেবেন?'

'হ্যাঁ, আমি একটু পরে গিয়ে দিয়ে আসব।' ভাবলাম ঝামেলা চুকিয়ে দেওয়াই ভালো।

'পাগল হয়েছেন আপনি! আমি ডেফিনিটলি বলতে পারি ওই ম্যানাস্ক্রিপ্ট নিয়ে আপনি কোনওদিনই আমাদের অফিসে সুস্থ অবস্থায় পৌঁছতে পারবেন না।'

'তা হলে?'

'আমি বরং গজানন শিকদার নামে আমার এক অতি-বিশ্বস্ত কর্মচারীকে পাঠাচ্ছি। আপনি ম্যানাস্ক্রিপ্টটার মতো একটা নকল প্যাকেট তৈরি করে হোটেলের কাস্টডিতে জমা দিন। তা হলে সবার নজর ওইদিকেই থাকবে। আর বাই দ্যাট টাইম পনেরো হাজার টাকার একটা চেক দিয়ে আমি গজানন শিকদারকে আপনার ওখানে পাঠাচ্ছি। আপনি ওর হাতে সুরেন্দ্র পালিতের ম্যানাস্ক্রিপ্টটা দিয়ে দেবেন। আচ্ছা, রাখছি—।'

প্রায় আধঘণ্টা পর একজন ভদ্রলোক এলেন। বললেন, 'আমি মেহেতা অ্যান্ড সন্সের গজানন শিকদার।' বলে একটা পনেরো হাজার টাকার চেক পকেট থেকে বের করলেন।

আমি ইতিমধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম। চেকটা নিয়ে পাণ্ডুলিপিটা তাঁর হাতে তুলে দিলাম। বললাম, 'মিস্টার শিকদার, সাবধানে যাবেন। আমার কিন্তু আর কোনও দায়িত্ব নেই।'

মৃদু হেসে গজানন শিকদার চলে গেলেন।

তিনি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই একটা বয় এসে একটা কার্ড আর চিঠি দিয়ে গেল। অবাক হয়ে সেটা নিলাম, দেখি তাতে লেখা :

শ্রী অশোক বোস সমীপেষু,

মহাশয়, আগামী রবিবার কবুতরে যে-পার্টি দেওয়া হচ্ছে তাতে আপনাকে সম্মানিত অতিথি হতে অনুরোধ করছি। বয়টির কাছে আপনার উত্তর দিলে বাধিত হব। ইতি—

সঙ্গের কার্ডে মানেকজী-প্রসাদজীর ফার্মের নাম ও কবুতরের ঠিকানা ছিল। বয়টিকে ডেকে ওগুলো ফেরত দিয়ে বললাম, 'দুঃখিত, তোমার মালিককে বোলো, আমি রবিবার দিন পার্টিতে বিশেষ কারণে যেতে পারছি না।'

বয়টি চিঠি ও কার্ড নিয়ে চলে গেল।

আমি এবার হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম। সব কাজ শেষ। এখন শুধু জানতে হবে কে ওই সুচরিতা চৌধুরী। নামটার মধ্যেই যেন কেমন এক প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে আছে।

হঠাৎ আমার চোখ গেল ড্রেসিং টেবিলের ওপর খোলা অবস্থায় রাখা একটা ফিল্ম ম্যাগাজিনের দিকে। এখনও পর্যন্ত নেড়েচেড়ে দেখিনি। হাওয়ায় ম্যাগাজিনটার কতকগুলো পাতা উলটে গেছে। সেখানে একজন মহিলার ফটো দেখা যাচ্ছে। নীচে লেখা : শ্রীমতী সুচরিতা চৌধুরী, মোতিবাগ।

লাফিয়ে উঠলাম আমি। ইস, যদি এঁরই হয়ে থাকে চিঠিগুলো! নাঃ, এক্ষুনি ওঁকে একবার সাবধান করে দিতে হবে। নয়তো বলা যায় না, চিঠিগুলো নিয়ে কেউ হয়তো মিসেস চৌধুরীকে ব্ল্যাকমেল করবে। ভদ্রমহিলা তা হলে এখানে বেশ পরিচিত দেখছি!

ভাবলাম শহর দেখতে বেরোব। উঠে দাঁড়িয়ে জামাকাপড় পালটাতে লাগলাম। মনে-মনে নিজের পিঠ চাপড়ে বললাম, 'এখন শ্রীযুক্ত অশোক বোস মঞ্চ থেকে প্রস্থান করবেন এবং তার পরিবর্তে মঞ্চে আবির্ভূত হবেন একমেবাদ্বিতীয়ম, আদি ও অকৃত্রিম, শ্রীযুক্ত কাঞ্চন মৈত্র!'

সুচরিতা প্রসাধন সেরে বেরোতে যাচ্ছিল। উদ্দেশ্য, তরুণের কাছ থেকে ঠিকানা জেনে শ্রীযুক্ত বোসের সঙ্গে দেখা করা। কী জানি কেমন দেখতে হবে ভদ্রলোককে! তিনি কি জানেন যে, সঙ্গে অ্যাটমবোমার মতো একটা ম্যানাস্ক্রিপ্ট নিয়ে তিনি ঘুরছেন! বোধহয় না।

বেরোনোর আগে কাজের লোককে ডেকে সুচরিতা বলল, 'যতীন, আমি একটু বেরোচ্ছি।'

কিন্তু দরজা খুলে বেরোতে যেতেই ধাক্কা লাগল একজন লোকের সঙ্গে। লোকটি বোধহয় ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল।

'মাপ করবেন,' লোকটি বলল, 'আপনিই কি মিসেস সুচরিতা চৌধুরী?'

'হ্যাঁ।' সুচরিতার ভ্রূ-কুঞ্চিত হল। কী চায় লোকটি? একে তো ও চেনে বলে মনে হচ্ছে না!

লোকটি ওর দিকে চেয়ে হাসল, দাঁতের ফাঁক দিয়ে বিচিত্র এক শব্দ করে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটু ব্যবসার ব্যাপারে গোপন কথা আছে।'

'গোপন কথা!' খুবই অবাক হল সুচরিতা।

'প্লিজ, দয়া করে দরজাটা ছাড়ুন, ম্যাডাম। এখানে দাঁড়িয়ে তো আর কথা হতে পারে না!' বলল লোকটি।

ইতস্তত করে সুচরিতা বলল, 'আচ্ছা—আসুন, ভেতরে আসুন।'

ভেতরে গিয়ে বসল দুজনে।

বিচিত্রভাবে হাসল লোকটি : 'আমার কাছে কতকগুলো কাগজ আছে।' বলল সে।

'কাগজ!' আবার অবাক হল সুচরিতা।

'লেখা কাগজ।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'আপনার লেখা কাগজ।'

'আমার লেখা!'

'কাউকে আপনার লেখা চিঠির কাগজ।'

'আমার লেখা চিঠি! দেখি!'

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে সুচরিতা চৌধুরীর হাতে দিল লোকটি: 'অনেকগুলো চিঠির একটি।'

চিঠি দেখে মনে-মনে হাসল সুচরিতা। এ-চিঠি ও কোনওদিনই লেখেনি। ওর হাতের লেখাও নয় এগুলো। শুধু লেখিকার নামের জায়গায় ওর নাম লেখা আছে।

কিন্তু কী উদ্দেশ্য এই লোকটির? ব্ল্যাকমেলিং? নাকি অন্য কোনও গভীর উদ্দেশ্য আছে?

মনে-মনে নিশ্চিত কিছু একটা ভেবে নিয়ে সুচরিতা বলল, 'এগুলো আপনি কেমন করে পেলেন?'

'দেখুন, আমার এখন খুব অভাব চলছে। তাই হাজার পঁচিশেক টাকার ব্যবস্থা যদি করেন...সব চিঠিগুলোর জন্যে।' অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল লোকটি।

মনে-মনে অতি দ্রুত চিন্তা করল সুচরিতা। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও

গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। ভাবল, দেখিই না কী উদ্দেশ্য।

সুচরিতা বলল, 'দেখুন, আপাতত আমার কাছে তো এত টাকা নেই। এই চিঠিটার জন্যে আমি শ'দুয়েক টাকা দিচ্ছি। আগামীকাল রাতে আপনি আসুন, তখন বাকি চিঠিগুলোর ব্যাপারে কথা বলা যাবে।'

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একশো টাকার দুটো নোট বের করে লোকটির হাতে দিল ও। চিঠিটা রেখে লোকটি চলে গেল।

চিঠিটা পড়ল সুচরিতা। নিছক একটা প্রেমপত্র। কী কারণে কে কাকে লিখেছিল তা বুঝতে পারল না। চিঠিটা ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে উঠে গিয়ে ফোন করল তরুণের অফিসে। সেখান থেকে অশোক বোসের হোটেলের নাম জেনে সেই হোটেলে ফোন করল।

'হ্যালো, হোটেল কন্টিনেন্টাল?'

'হ্যাঁ—কাকে চান?'

'অশোক বোসকে—।'

'কাইন্ডলি একমিনিট অপেক্ষা করুন, লাইন দিচ্ছি—।'

কিছুক্ষণ পর টেলিফোনে কারও কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কে কথা বলছেন?'

'আমি কি অশোক বোসের সঙ্গে কথা বলছি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে বলছেন?'

'মিসেস সুচরিতা চৌধুরী—।'

ওদিকের কণ্ঠস্বর চমকে উঠল মনে হল : 'মিসেস চৌধুরী!'

'হ্যাঁ। আপনার কাছেই তো নটোরিয়াস ম্যানাস্ক্রিপ্টটা রয়েছে, না?'

'কাছাকাছি গিয়েছিলেন। আছে নয়, ছিল।'

'তার মানে! তার মানে আপনি—?'

'ঠিকই ধরেছেন। ওটা এখন মেহেতা অ্যান্ড সন্সের কাছে। আজ সকালেই ওটা ওদের হাতে তুলে দিয়েছি।'

'ওঃ—।' সুচরিতা যেন আশাহত হলেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রিসিভার নামিয়ে রাখল।

ওপারের কণ্ঠস্বর তখনও বলছিল, 'কিন্তু মিসেস চৌধুরী, আপনার সঙ্গে আমার—।'

সুরেন্দ্র পালিত, কুমার রণজিৎ, মৃত কুমার অতলান্ত রায়, মানেকজী, প্রসাদজী, তরুণ, অমিত এবং অশোক বোস—সবাই যেন সুচরিতার চারপাশে এসে ছায়ার মতো ভিড় করে দাঁড়িয়েছেন। সবাই হাত বাড়িয়ে ওর থেকে যেন কিছু চাইছেন।

চকিতে সুচরিতার মনে পড়ল ব্ল্যাকমেলারটির কথা। আবার আগামীকাল! চোখ বুজল সুচরিতা।

পরদিন রাত দশটার সময় ক্লাব থেকে ফিরল সুচরিতা। একটু বেশিই দেরি করে ফেলেছে আজ। কিন্তু সদর দরজা হাট করে খোলা কেন! দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢুকল। যতীনকে কোথাও দেখতে পেল না। কোথায় যেতে পারে! হঠাৎই লক্ষ করল, একটুকরো কাগজ মেঝেতে হাওয়ায় উড়ছে। কৌতূহলে কুড়িয়ে নিল ওটা। এ যে একটা চিঠি! তাতে লেখা :

যতীন,

শিগগিরই চাঁদনিচকের বাজারের কাছে চলে আয়। অনেক জিনিসপত্র কিনে ফেলেছি। —দিদিমণি।

অবিশ্বাস্য! কোনও চিঠি ও যতীনকে পাঠায়নি। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে, ক্লাবের ফোন খারাপ থাকলে মাঝে-মাঝে এ ধরনের চিঠি ও ক্লাব থেকে পাঠিয়ে থাকে। কিন্তু ক্লাবের ফোন তো ঠিকই আছে!

অর্থাৎ, সব জেনেশুনেই এই চিঠিটা কাউকে দিয়ে পাঠনো হয়েছে।

পায়ে-পায়ে শোওয়ার ঘরে এসে সুচরিতার বিস্ময় আতঙ্কে পালটে গেল। শোওয়ার ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে একজন চেনা লোক। একটা সুদৃশ্য ছুরি তার হৃৎপিণ্ডকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। লোকটি এই হিসেবে চেনা যে, তাকে আগের দিনই সুচরিতা দেখেছে। এ সেই ব্ল্যাকমেলার!

তার মানে টাকার জন্য সে আজ সময়মতোই এসেছিল! কিন্তু কে মারল ওকে?

হতভম্ব অবস্থায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুচরিতা। আজই ওকে কবুতরে যেতে হবে। ও মিটিং-এ যাবে, কারণ অশোক বোসের ব্যাপারটা মিটে গেছে। কিন্তু এ কী ঝামেলা? এরপর পুলিশ আসবে। ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ব্ল্যাকমেলিংয়ের কথা বেরিয়ে পড়বে। ও যে শুধুমাত্র কৌতূহল মেটানোর জন্যই দুশো টাকা দিয়েছে তারা তা শুনবে না। তার মানে নিঃসন্দেহে ওঁকে কিছুদিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে থাকতে হবে। অর্থাৎ, মিটিং-এ যাওয়া যাবে না। কিন্তু কারা ওকে এভাবে রহস্যের জালে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে!

এই মুহূর্তে কারও সাহায্য খুব দরকার এই ভেবে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল সুচরিতা। তখনই দেখল একজন সুপুরুষ যুবক ওর বাড়ির নেমপ্লেটের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

হাতে যেন চাঁদ পেল সুচরিতা। কিন্তু ওকে দেখামাত্রই লোকটি বলে উঠল, 'মিসেস চৌধুরী, তাই না?'

'আপনি আমাকে চিনলেন কেমন করে?'

একটা সিনেমা-ম্যাগাজিনের একটা ছেঁড়া পাতা তুলে ধরল লোকটি : 'আমার নাম কাঞ্চন মৈত্র।'

'দেখুন,' ইতস্তত করে শুরু করল সুচরিতা, 'মানে, আমার ঘরে একজন লোক মরে পড়ে আছে—মানে, তাকে কেউ খুন করেছে। আপনি যদি পুলিশে... মানে...।'

তার বেশি আর বলতে হল না। 'কোথায় বডি?' বলে তৎপর হয়ে উঠল কাঞ্চন। সুচরিতা জবাব দেওয়ার আগেই ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল সে।

সুচরিতার মাথা ঠিকঠাক কাজ করছিল না। তাই বোধহয় প্রথম দেখাতেই একজন অচেনা মানুষকে বিশ্বাস করে ফেলেছে। কিন্তু....।

কোনও উপায় না দেখে সদর দরজা বন্ধ করে কাঞ্চনকে অনুসরণ করে শোওয়ার ঘরে এল সুচরিতা।

ঘরের অবস্থা দেখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কাঞ্চন। তার মুখ দিয়ে বিস্ময়ের শব্দ বেরিয়ে এল। তারপর নিজেকে সামলে বলল, 'বাড়িতে আর কে-কে আছে?'

'আপাতত কেউ নেই, তবে একজন কাজের লোক আছে—এখন বাইরে গেছে।'

'সে এলে দূরের একটা দোকান-টোকানে পাঠিয়ে দেবেন। ততক্ষণে আমি দেখি কদ্দুর কী করতে পারি।' বলে চটপট কাজে লেগে গেল সে।

তাকে সাহায্য করতে নিজেও হাত লাগাল সুচরিতা।

প্রায় একঘণ্টা পর বাইরের দরজায় কারও নক করার শব্দ শোনা গেল।

'ওই বোধহয় যতীন এসেছে,' বলে কাঞ্চনের দিকে একটা ইশারা করে বলল, 'প্লিজ কোনও শব্দ করবেন না। আমি এখুনি আবার ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' সুচরিতা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ইতিমধ্যে লাশটাকে একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে রাখা হয়ে গেছে। তখনই হঠাৎ ছোরার হাতলটার দিকে চোখ গেল কাঞ্চনের। সে কি ভুল দেখছে নাকি? এই তো! এই তো লেখা রয়েছে পরিষ্কারভাবে : সুচরিতা চৌধুরী।

সর্বনাশ! তা হলে তো ছুরিটার আলাদা একটা ব্যবস্থা করতে হয়! চটপট হাতে রুমাল জড়িয়ে এক হ্যাঁচকায় ছুরিটাকে বের করে নিল কাঞ্চন। রক্ত এতক্ষণে জমাট বেঁধে আসায় বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হল না।

এই সময় আবার ঘরে এসে ঢুকল সুচরিতা। ওকে দেখেই কাঞ্চন বলল, 'দেখুন তো, কিছুটা ব্রাউন পেপার আনতে পারেন কি না। এই ছোরাটাকে মুড়ে একটা প্যাকেটমতো করতে হবে।'

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সুচরিতা।

ট্রাঙ্কের ডালাটা বন্ধ করতে গিয়েই দ্বিতীয় বিস্ময়। একচিলতে কাগজ উঁকি মারছে ইব্রাহিমের পকেট থেকে।

হ্যাঁ, এ-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই নেই : মৃত লোকটি হোটেল কন্টিনেন্টালের সেই রহস্যময় বেয়ারা ইব্রাহিম।

নিচু হয়ে চিরকুটটাকে বের করে নিল কাঞ্চন। তাতে লেখা :

কবুতর, রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশ।

কাগজটা পকেটে গুঁজল সে।

কিছুক্ষণ পরই ব্রাউন পেপার হাতে ঘরে ঢুকল সুচরিতা।

সব কাজ সেরে তৈরি হয়ে কাঞ্চন বলল, 'মিসেস চৌধুরী, আপনি ঘরটাকে আর-একবার ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে রাখুন। আমি আপনার গাড়িটা নিয়ে এগুলোর ব্যবস্থা করতে রওনা হচ্ছি। গাড়িটা হয়তো কাল আপনাকে ফেরত দিয়ে যাব। আশা করি, আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন।'

সুচরিতা এমনভাবে হাসল যার অর্থ, বিশ্বাস না করে উপায় কী!

ওরা দুজনে মিলে ট্রাঙ্কটাকে বাইরে এনে গাড়ির ডিকিতে রাখল। কাঞ্চন গাড়ি ছেড়ে দিল। যাওয়ার আগে সুচরিতার দিকে আশ্বাসের একটা মিষ্টি হাসি ছুড়ে দিয়ে গেল।

সুচরিতা ভাবছিল। মিটিং আগামীকাল। কিন্তু আজ রাত থেকেই সকলের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে কবুতরে। ওরও আজ রাতেই যাওয়ার কথা।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল সুচরিতা। যতীন ফিরে এলেই ও বেরোবে। লক্ষ্য কবুতর।

মিটিং-এ ওর থাকাটা কি বিপজ্জনক? তাই কি এই রহস্যময় জঘন্য খুনের খেলা? কিন্তু কারা, কেন, মিটিংয়ে ওর হাজিরা চায় না? সেটাই—সেটাই এখন জানতে চায় সুচরিতা।

কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটা দেখার লোভ সামলাতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত খুনই হল ইব্রাহিম! কার দলের হয়ে কাজ করছিল ও? লালপাঞ্জা কি? হতে পারে। হয়তো তাদের কথার অবাধ্য হয়েই সুচরিতা চৌধুরীকে

ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল ইব্রাহিম। তাই হয়তো লালপাঞ্জার এই নিষ্ঠুর শাস্তি।

কিন্তু চিঠিগুলো গেল কোথায়? সুচরিতা চৌধুরী বাড়িতে ঢোকার আগে কি কেউ ঢুকেছিল ওঁর বাড়িতে? গাড়ি চালাতে-চালাতে এই সব কথা মনে পড়ছিল। অথচ একইসঙ্গে আর-এক চিন্তা। সেটা হল, এই লাশটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লুকিয়ে ফেলতেই হবে—যাতে এটা খুঁজে বের করতে অন্তত দু-তিনদিন সময় লাগে।

হঠাৎই একটা কথা মনে এল। সুচরিতা চৌধুরীকে এই খুনের সঙ্গে জড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে কেন? ওঁর বাড়িকেই খুনের জায়গা হিসেবে বেছে নেওয়া হল! ছুরির বাঁটেও ওঁরই নাম লেখা! অর্থাৎ, কেউ-কেউ কবুতরে সুচরিতা চৌধুরীর উপস্থিতি চান না। কারণ? সুচরিতা মিটিংয়ে হাজির হলে কি কোনও বিপদের সম্ভাবনা আছে? কেন? কার?

চিন্তার জালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। স্টিয়ারিং ধরে সোজা হয়ে বসলাম। শহরতলিতে চলে এসেছি বুঝতে পারলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্জন রাস্তার ধারে একটা গাছের কাছে গাড়ি থামালাম। ক্যারিয়ার খুলে ট্রাঙ্কটাকে বের করে রাস্তার ধারের নর্দমার দিকে গড়িয়ে দিলাম। দু-চারবার উলটে-পালটে ট্রাঙ্কটা নর্দমার মধ্যে গিয়ে পড়ল। এইবার ব্রাউন পেপারে মোড়া ছুরিটাকে পকেট থেকে বের করে চিন্তা করতে লাগলাম, কোথায় লুকনো যায় এটাকে।

হঠাৎই একটা মতলব মাথায় আসাতে হেসে উঠলাম। তারপরই ছুরিটাকে পকেটে রেখে চটপট গাছে উঠে পড়লাম। দুটো ডালের খাঁজে সাবধানে গেঁথে দিলাম ওটা। গাছে উঠে খোঁজার কথা পুলিশের নিশ্চয়ই মাথায় আসবে না।

গাছ থেকে নেমে হাতঘড়ির দিকে নজর দিলাম। পৌনে বারোটা। ফিরে যাওয়ার জন্যে গাড়িতে উঠে গাড়ি ছাড়তেই মনে পড়ল সেই কাগজটার কথা। ইব্রাহিমের পকেট থেকে পাওয়া চিরকুটটার কথা। কবুতর, রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশ। কবুতরে রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশে কি কিছু ঘটবে নাকি? কবুতরের ঠিকানাটা ভাগ্যিস মনে রয়েছে এখনও। অতএব ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম কবুতরের উদ্দেশে। যে করেই হোক, বারোটা পঁয়তাল্লিশের আগেই কবুতরে আমার পৌঁছনো চাই-ই চাই! আরও জোরে চাপ দিলাম অ্যাকসিলারেটরে।

শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হলাম কবুতরে। হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত বারোটা চুয়াল্লিশ। আর এক মিনিট বাকি।

গাড়ি ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সামনেই দেখা যাচ্ছে প্রসাদজীর

বাগানবাড়ি—কবুতর। কবুতর নাম সত্যিই সার্থক হয়েছে। গোটা বাড়িটা ধপধপে সাদা। যেন কোনও রাজহংসী ডানা মেলে রয়েছে উড়ে যাওয়ার জন্যে।

কবুতরের সদর গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। বাড়িটার কোনও ঘরেই আলো দেখা যাচ্ছে না। নিঝুম নিস্তব্ধ। সুরকি ঢালা পথ ধরে এগিয়ে চললাম। কিন্তু কিছুটা যেতেই এক বিকট শব্দ ভেসে এল বাড়ির ভেতর থেকে।

গুড়ুম।

নিশ্চয়ই গুলির শব্দ!

শব্দটা একতলার কোনও ঘর থেকেই এল বলে মনে হল। পরমুহূর্তেই দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠল। আমি তীরবেগে ছুটলাম শব্দের উৎস লক্ষ্য করে। কে জানে, পরমুহূর্তে আমি কী দেখতে চলেছি!

দৌড়ে গিয়ে উঠোন পার হয়ে একতলার একটা ঘরের কাছে পৌঁছলাম। ঘরের সবকটা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোই ভেতর থেকে আটকানো। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। জানলার শার্সিগুলো ধরে টানাটানি করলাম। নাঃ, ভেতর থেকেই বন্ধ।

হঠাৎই আমি একটু ভয় পেলাম। এইরকম অবস্থায় কেউ যদি আমাকে আবিষ্কার করে, তবে! এ-কথা মনে হতেই আবার ছুটলাম গাড়ি লক্ষ্য করে। গাড়িতে পৌঁছে আর-একবার ঘুরে তাকালাম কবুতরের দিকে। সেই আলোটা এখন নিভে গেছে। গাড়িতে বসে স্টার্ট দিলাম।

গাড়ি চালাতে-চালাতে আবার মনে হল ইব্রাহিমের পকেটে পাওয়া সেই চিরকুটটার কথা। ইব্রাহিমের এখানে আসার কথা ছিল। আর তার বদলে এসেছি আমি। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। কিন্তু সুচরিতা? সুচরিতা যদি কবুতরে পৌঁছে থাকে, তবে ও গেল কোথায়! গুলির আওয়াজে কি কারওরই ঘুম (একজন বাদে, যার ঘরে আলো দেখা যাচ্ছিল) ভাঙল না!

যাই হোক, আমি আবার আসব এই কবুতরে—মিটিংয়ে যোগ দিতে।

নোবডি ক্যান স্টপ মি ফ্রম কামিং হিয়ার। আপনা থেকেই আমার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

পরদিন ভোরবেলা খবরের কাগজে খবরটা দেখে চমকে উঠলাম। কবুতরে আমার প্রায় চোখের সামনে গতকাল রাতে যিনি নিহত হয়েছেন, তিনি সিরাজনগরের বর্তমান প্রধান কুমার রণজিৎ সেন।

তা হলে মিটিং-এ এসেছিলেন তিনি! কিন্তু তাঁকে খুন করে কার লাভ? কেউ কি চেয়েছিল যে, কুমার রণজিৎ মিটিংয়ের আলোচনায় যোগ না দেন?

কিন্তু কেন?

এ কী জটিল রহস্যের মুখোমুখি হলাম! রহস্যময় পাণ্ডুলিপি। ইব্রাহিমের মৃত্যু। সুচরিতা চৌধুরীর নাম ধার করে লেখা প্রেমপত্র। সুচরিতা চৌধুরীকে মিটিংয়ে যেতে বাধা দেওয়া। কুমার রণজিতের মৃত্যু। লালপাঞ্জা—উঃ, কে জানে এর পরের অধ্যায় কী!

যা হোক, কবুতরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলাম। অসুবিধে হবে না। কারণ, সুচরিতা চৌধুরীর গাড়িটা সঙ্গে রয়েছে। মিনিটদশেকের মধ্যেই তৈরি হয়ে গাড়িতে করে রওনা দিলাম। উদ্দেশ্য—কবুতর। কে জানে, হয়তো আরও কী রহস্য সেখানে আমার জন্যে ওত পেতে রয়েছে।

কবুতরে পৌঁছেই প্রথম যেটা চোখে পড়ল তা হল সারা বাড়ি জুড়ে একটা থমথমে ভাব। গেটের কাছে গাড়ি থামিয়ে সুরকি ঢালা পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। বাড়ির কাছে পৌঁছতেই কবুতরের একতলার বাঁদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সুচরিতা চৌধুরী। গাঢ় বেগুনি রঙের শাড়িতে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে!

কিছুক্ষণ বোধহয় হাঁ করে চেয়েছিলাম ওর দিকে। চমক ভাঙতেই জোর করে হাসার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু সুচরিতার চোখের তারায় আশঙ্কার ছায়া কেঁপে উঠল। হরিণী-গতিতে ও এগিয়ে এল আমার কাছে। অস্ফুটভাবে বলল, 'আপনি এখানে! আপনার—আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

একটু অবাক হলেও সে-ভাবটা মুখে প্রকাশ করলাম না। কবুতরের বাইরে এসে দুজনে উঠে বসলাম গাড়িতে। গাড়ি ছেড়ে দিলাম। লক্ষ্য, উদ্দেশ্যবিহীন।

কিছুদূর যাওয়ার পর আড়চোখে তাকালাম সুচরিতার দিকে। ওর চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখে অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, 'ভয় নেই। ইব্রাহিমকে খুঁজে বের করতে পুলিশের অন্তত দিনদুয়েক লাগবে।'

তারপর ওকে শুরু থেকে আমার কাহিনী শোনালাম—সব বললাম। শেষে জিগ্যেস করলাম, 'কিন্তু সুচরিতা, এদিকের খবর কী?'

এ-কথা বলেই হৃৎপিণ্ডে এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। চোখ, মুখ, কান লাল হয়ে উঠল। সর্বনাশ! ওকে নাম ধরে ডেকে ফেলেছি!

কিন্তু এ কী! সুচরিতা মাথা নিচু করে ছিল। আমার দিকে চোখ তুলে এক চিলতে হাসল। আমি সাহস করে বাঁ হাতটা ওর হাতের ওপর রাখলাম। বুঝলাম আমরা দুজনেই দুজনকে জানতে চাই।

এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালাতে-চালাতে বললাম, 'সুচরিতা, আমরা একটা কিছু করতে পারি না?'

'কী?' আনন্দে, কৌতূহলে ওর মুখ ঝলমল করছিল।

'না, মানে, এই যে সব রহস্য—সেগুলো সল্‌ভ করার চেষ্টা করলে ক্ষতি কী?'

'তা হলে তো দারুণ হবে।' ছোট্ট মেয়ের মতো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুচরিতা।

আমি ওকে গতরাতের সব কথা খুলে বললাম। ও চোখ বড়-বড় করে শুনল।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা, দোতলার বাঁদিক থেকে তিন নম্বর জানলাটা কার ঘরের?'

'ওই ঘরেই কি আলো জ্বলতে দেখেছিলে তুমি?'

'মনে তো হয় তাই।'

'কিন্তু, তা হলে তো ঠিক মিলছে না।' একটু চিন্তিতভাবেই জানাল সুচরিতা।

'কেন? কেন?'

'ওই ঘরটায় মানেকজীর এক দূরসম্পর্কের বোন থাকেন। তিনি তো বেশ কয়েকদিন হল আছেন। ওঁকে ঠিক এ-ব্যাপারে ...।'

মাঝপথে বাধা দিলাম আমি, বললাম, 'সূত্র যখন পাওয়া গেছে, তা যতই সামান্য হোক, তাই ধরেই এগোব আমরা। আমি ওই ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিচ্ছি। ওঁর নাম কী?'

'নয়না কল্যাণী।'

'এবার তবে কবুতরে ফেরা যাক।' বললাম আমি, 'কিন্তু আমার সঙ্গে কী অনেক কথা আছে বলছিলে যেন?' হঠাৎই মনে পড়ায় প্রশ্ন করলাম।

'কুমার রণজিৎ গতকাল রাতে রিভলবারের গুলিতে মারা গেছেন।'

'কাগজে পড়েছি। তুমি তাঁকে দেখেছ নাকি?'

'না। তবে সিরাজনগরে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল।'

সঙ্গে-সঙ্গে একটা সম্ভাবনা বিদ্যুৎঝলকের মতো আমার মানসচক্ষে ধরা পড়ল। চকিতে ব্রেক কষে দাঁড় করালাম গাড়িটাকে। ব্যাক করে ঘুরিয়ে নিয়ে হাওয়ার বেগে আবার গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম।

'এ কী! কী হল?' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল সুচরিতা।

'এখন আর কোনও প্রশ্ন নয়। এই মুহূর্তে আমাদের কবুতরে পৌঁছনো দরকার।' দাঁতে দাঁত চেপে বললাম আমি, 'তোমার কবুতরে পৌঁছনো বন্ধ করার চেষ্টা যারা করছিল তাদের উদ্দেশ্য আমি বোধহয় বুঝতে পেরেছি।'

'তার মানে!' কৌতূহলের ঝাপটায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে সুচরিতা।

'এই কুমার রণজিৎ সম্ভবত তোমার পরিচিত কুমার রণজিৎ নন।'

সুচরিতার মুখ থেকে শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। আমি বলে চললাম, 'যে এখানে কুমার রণজিৎ পরিচয়ে এসেছে, সে জানে যে, তোমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল হবে। তাই কবুতরে তুমি যাতে না আসতে পারো সেই ব্যবস্থা করেছিল। হয়তো সমর বর্মনই এখানে কুমারের ছদ্মবেশে এসে শত্রুপক্ষের হাতে মারা গেছে।'

'কিন্তু সমর বর্মন এখানে আসবে কেন?'

'সুরেন্দ্র পালিত রাণী সুলক্ষণার হীরের নেকলেস কবুতরেই লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর ম্যানাস্ক্রিপ্টেই এরকম হিন্ট্‌স ছিল। বর্মন সেই খবর পেয়ে হয়তো...।'

কবুতরের বাইরে গাড়ি থামিয়ে সুচরিতার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললাম। উত্তেজনায় তখন আমার আর মাথার ঠিক নেই। হাঁটতে-হাঁটতেই ওকে জিগ্যেস করলাম, 'পুলিশ কি এখনও কবুতরে রয়েছে?'

কোনওরকমে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল সুচরিতা।

কবুতরের একতলার দরজা দিয়ে দুজনে ঢুকলাম। ডানদিকেই লাইব্রেরি। সেই ঘরের দরজা পেরিয়ে ভেতরে পা দিলাম দুজনে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই চমকে উঠলাম।

কাঞ্চনবাবু, প্লিজ, একটিবার পেছন ফিরে তাকান। একটিবার—। দেখুন শিগগিরই। ওই দেখুন, কালো পোশাক পরা একটি লোক আপনার রেখে যাওয়া গাড়ির পেছনের সিটের নীচ থেকে বেরিয়ে এল। গাড়ির দরজা বন্ধ করে একটু হাসল। ওই দেখুন, সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরের বনানীতে। লোকটি কে বলুন তো! লোকটাকে যে আপনি চেনেন না সে-কথা হলফ করে বলতে পারি। প্লিজ, আমার কথা এখনও শুনুন। কবুতরে কেন এলেন! ওই লোকটি প্রথম থেকেই পেছনের সিটের নীচে লুকিয়ে ছিল। কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড বলুন তো!

আপনাকে তো প্রথমেই বলেছিলাম, প্লিজ, কবুতরে আসবেন না।

লাইব্রেরিতে পা দিয়েই চমকে উঠলাম আমি। পুলিশের লোকজন ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাইব্রেরির র‍্যাকে সাজানো থরে-থরে বই। মাঝখানে রাখা টেবিলটার নীচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে তাকে। যে-লোকটি শূন্য দৃষ্টি মেলে চিৎ হয়ে সিলিংয়ের

দিকে চেয়ে আছে সে আমার বিশেষ পরিচিত। মেহেতা অ্যান্ড সন্সের কর্মচারী, গজানন শিকদার।

সুচরিতা আমার কানে ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ, ইনিই কুমার রণজিৎ। আমি শিয়োর।'

তা হলে কুমার রণজিৎই মারা গেছেন! শেষ পর্যন্ত কুমার রণজিৎ নিজেই গিয়ে ভাঁওতা দিয়ে আমার কাছ থেকে সুরেন্দ্র পালিতের ম্যানাস্ক্রিপ্টটা হাতিয়েছিলেন! বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, কুমার নিজেই গজানন শিকদারের পরিচয় নিয়ে আমার কাছে গিয়েছিলেন। তার মানে মেহেতা অ্যান্ড সন্স থেকে যে-ফোন এসেছিল, সেটা ভাঁওতা দিয়ে কুমার রণজিতই করেছিলেন।

যাকগে, ওই ম্যানাস্ক্রিপ্টটার জন্যে হা-হুতাশ করে কোনও লাভ নেই। সুচরিতার গা টিপে ফিসফিস করে বললাম, 'সু, চলো আমরা যাই—।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরোতে যেতেই একটা হাত আমার কাঁধের ওপর এসে পড়ল।

চমকে পেছন ফিরে তাকালাম আমি। চোখে পড়ল কাঠে খোদাই করা ভাবলেশহীন একটা বলিষ্ঠ চেহারা। একটু মৃদু হাসি ঠোঁটের রেখায় টেনে তিনি বললেন, 'মিস্টার...প্লিজ টেক ইওর সিট,' বলে লাইব্রেরি-ঘরের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

আমি সুচরিতার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে চোখ তুলে তাকাতেই তিনি বললেন, 'আ অ্যাম নোন টু এভরিবডি বাই দ্য নেম ক্রসওয়ার্ড। যদিও আমার নাম ওয়াডি ক্রসবি।'

'কাঞ্চন মৈত্র—।' বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'বলুন, আমি আপনাদের কী কাজে লাগতে পারি?' ইন্সপেক্টরকে বাঙালি ক্রিশ্চান বলে মনে হল।

'আমি এখানকার থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর,' মুখ খুললেন ক্রসওয়ার্ড, 'কুমার রণজিতের মিস্টিরিয়াস ডেথের ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করার ভার আমার ওপর পড়েছে। আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি না। আর তা ছাড়া আপনি ঘরে ঢুকেই কুমারের ডেডবডিটা দেখে যেভাবে চোখ কপালে তুললেন...।' কথা অসম্পূর্ণ রেখে চোখ নাচালেন ক্রসওয়ার্ড।

এরপর মুখ না খুলে চুপ করে থাকা হবে স্রেফ বোকামি। তাই একটুও সময় নষ্ট না করে বললাম, 'ইন্সপেক্টর, আমি সুচরিতার বন্ধু। ওয়েল উইশার বলতে পারেন। কুমারের মারা যাওয়ার খবর আমি কাগজেই পড়েছি, কিন্তু তাঁর ডেডবডি দেখে আমার অবাক হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে...।'

তারপর প্রথম থেকে শুরু করে সব খুলে জানালাম তাঁকে। অবশ্য ইব্রাহিমের

ব্যাপারটা বাদ দিলাম।

সব শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ইন্সপেক্টর। তারপর বললেন, 'মিস্টার মৈত্র, এবার কাজের কথায় আসা যাক। কাল রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেছে। কবুতরের সবাইকেই আমরা প্রশ্ন করেছি, কেউ কিছু বলতে পারেননি। তাই আমরা কবুতরের চারিদিকে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, একজন লোককে একটা গাড়ি চালিয়ে বারোটা সোয়া বারোটা নাগাদ কবুতরের দিকে যেতে দেখা গেছে। আপনাকে দেখে আমিও কম অবাক হইনি। কারণ, আপনার সঙ্গে সেই অপরিচিত লোকটির ডেসক্রিপশান প্রায় মিলে যাচ্ছে...।'

'কী...।' ইন্সপেক্টরকে বাধা দিয়ে বলতে গেলাম আমি। কিন্তু ক্রসওয়ার্ড বাধা দেওয়ায় আমার চাইতেও বেশি এক্সপার্ট। তিনি চটপট বলতে শুরু করলেন, 'সেইটাই সব নয়। আমরা কবুতরের সুরকি ঢালা পথে একসারি জুতোর ছাপ পেয়েছি। ছাপগুলোর মধ্যে দূরত্ব বেশি এবং তাদের ডেপ্‌থ দেখে আমরা আন্দাজ করছি যে, গত রাতে যে-ই এসে থাকুক না কেন, সে দৌড়েছিল। কবুতরের প্রত্যেকের জুতোর ছাপ আমরা নিয়েছি।' আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন ক্রসওয়ার্ড, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। কারও সঙ্গে সেই ছাপ মেলেনি। এখন আপনার জুতোর সঙ্গে যদি এই ছাপটা না মেলে তবে আমাদের আরও ভালো করে প্রোব করে দেখতে হবে...।' একটু থেমে দম নিলেন ক্রসওয়ার্ড।

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে বললাম, 'লুক হিয়ার, ইন্সপেক্টর। শুধু-শুধু আপনাদের পরিশ্রম আর খরচ বাড়িয়ে লাভ নেই। আমিই সেই রাতের আগন্তুক। আমিই এসেছিলাম কবুতরে।'

ইন্সপেক্টর অবাক-টবাক কিছুই হলেন না। অল্প-অল্প হাসতে লাগলেন।

অত্যন্ত বিরক্ত হলেও বিরক্তি চেপে বললাম, 'মিস্টার ক্রসওয়ার্ড, ইফ ইউ ওয়ান্ট মাই কো-অপ দেন প্লিজ স্টপ লাফিং।' তারপর কাল রাতে যা-যা হয়েছিল সব খুলে বললাম।

ইব্রাহিমের পকেট থেকে পাওয়া সেই চিরকুটটার কথা চেপে গিয়ে বললাম, 'আমি সন্দেহ করেছিলাম যে, কবুতরে একটা কিছু ঘটতে চলেছে। তাই শখের গোয়েন্দাগিরির নেশাতেই কবুতরের ওপর লক্ষ রাখতে গত রাতে এসেছিলাম।'

জানি না আমার ব্যাখ্যাটা কতটা জোরদার হল। কিন্তু ইন্সপেক্টরের মুখ দেখে মনে হল তিনি আমার কথা মোটামুটি বিশ্বাস করেছেন।

হঠাৎই মুখ তুলে বললেন তিনি, 'মিস্টার মৈত্র, একটা প্রশ্ন করব—ভালো করে ভেবে উত্তর দিন।'

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম তাঁর দিকে।

'আপনি কি শিয়োর যে, জানলাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল?'

'হ্যাঁ,' দৃঢ়স্বরে জবাব দিলাম আমি, 'আমি গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওটা টানাটানি করেছিলাম। কিন্তু নড়াতেই পারিনি।' বলতে-বলতে আমি লাইব্রেরির তিনটে জানলার মধ্যে বাঁদিকেরটা দেখিয়ে বললাম, 'ওই তো, ওই জানলাটা।'

'কিন্তু এইখানেই একটা মুশকিল দেখা দিয়েছে, কাঞ্চনবাবু। আজ যখন আমরা এই ঘরে আসি তখন শুধু একটা জানলা খোলা ছিল এবং ওই জানলাটাই।'

'আশ্চর্য,' বললাম আমি, 'তা হলে নিশ্চয়ই যে খুন করেছে, সে এটাই বোঝাতে চেয়েছে যে, খুনী বাইরের লোক। জানলা দিয়ে এসে খুন করে আবার জানলা দিয়েই চলে গেছে।'

'ঠিকই ধরেছেন আপনি,' বললেন ইন্সপেক্টর, 'কিন্তু জানলায় আপনার ছাড়া আর কারও হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। তবে আপনার হাতের ছাপগুলো আপনার কথামতো শুধু বাইরের দিকেই ছিল।'

আমি চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলাম, বললাম, 'মার্ডার ওয়েপনটা পেয়েছেন?'

'নাঃ,' জানালেন ইন্সপেক্টর, 'সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমার লোকেরা রিভলবারটা বের করতে পারেনি। তবে আশা করি দিনকয়েকের মধ্যেই খুঁজে পাব। আচ্ছা, নমস্কার—আপনি এখন যেতে পারেন। পরে যদি দরকার হয় আপনার সঙ্গে কথা বলব'খন।'

কোনওরকমে নমস্কার জানিয়ে শ্লথ পায়ে দরজার দিকে এগোলাম।

সুচরিতা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। আমার পেছন-পেছন সেও বেরিয়ে এল বাইরে।

বাইরে এসে আমি বললাম, 'সুচরিতা, কবুতরে যারা রয়েছেন তাঁদের নামের একটা লিস্ট আমাকে দাও।'

সুচরিতা বলল, 'মানেকজী, প্রসাদজী, তরুণ সান্যাল—মানেকজীর সেক্রেটারি। শ্রীনরসিংহ চৌধুরী আর কিরণ শর্মা। এঁরা হলেন লয়ালিস্টদের তরফের। কিরণ শর্মা কুমার রণজিৎকে ফাইনান্স করতে রাজি ছিলেন। নয়না কল্যাণী এবং সর্বেশ্বর রায়—তেলের ব্যাপারটায় এঁর স্বার্থ ছিল। এঁরা ছাড়া কুমারের একজন নেপালী চাকর আর কবুতরের কাজের লোকজন।'

আমার মনে নামগুলো গেঁথে গেল। বললাম, 'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়া শুরু করব এবার। প্রথম কাণ্ড হলেন নয়না কল্যাণী।'

আমার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। গজানন শিকদার আর কুমার রণজিৎ এক ও অভিন্ন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও কথাটা সত্যি!

কাঞ্চনবাবু, এই যে, ...আপনি কিন্তু একজনকে বিশেষভাবে বাদ দিয়ে গেছেন। সুচরিতাদেবীকে আপনি ভালোবাসেন—তাই ওঁকে বাদ দেওয়ার যুক্তি থাকতে পারে—। চাকরবাকরদের মোটিভ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এসব মানলাম। কিন্তু ওই লোকটিকে আপনি বাদ দিলেন কী বলে! আরে, ওই লোকটা, যে কালো পোশাক পরে গাড়ির সিটের নীচে লুকিয়ে আপনাদের কথা শুনছিল। দেখুন না, ওই দেখুন—সে এখনও দাঁড়িয়ে আছে কবুতরের সদর গেটের কাছে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে আপনার দিকে। হাতে সিগারেট। দেখুন না, কাঞ্চনবাবু, প্লিজ এদিকে তাকান না একবার—!

কবুতর থেকে শ'পাঁচেক গজ দূরে গাছ-গাছড়ার একটা জঙ্গলের মতো রয়েছে। বনই বলা যেতে পারে সেটাকে। এবড়োখেবড়ো জমি। বড়-বড় বট, অশথ, দেবদারু ইত্যাদি গাছ জায়গাটাকে ছেয়ে ফেলেছে। সেইখানে পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছিলাম আমি আর সুচরিতা।

আমি এখন কবুতরের অতিথি। আমিই যে অশোক বোস নাম নিয়ে ভাগ্যচক্রে পাণ্ডুলিপির জালে জড়িয়ে পড়েছিলাম সেটা প্রসাদজীকে খুলে বলেছি। এখন ব্যাপারগুলোর একটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত কবুতরেই থাকব আমি।

বিকেলের সোনা-রোদ যেন অনেক কষ্ট করে লুকোচুরি খেলে গাছের আড়াল দিয়ে এসে পড়েছে আমাদের গায়ে। মাঝে-মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটা আদর টের পাচ্ছিলাম। পাশাপাশি হেঁটে যেতে কী ভালো যে লাগছিল! মনে হচ্ছিল, যদি এই পথ আর না ফুরোয়....।

হাতে হাত ধরে ঝরাপাতার পথ মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে-যেতে তাকালাম সুচরিতার দিকে। সুচরিতাও আমারই দিকে চেয়ে ছিল। চোখাচোখি হতেই ফিক করে হেসে ফেলল। আমি একটু বোকা-বোকা হাসি হেসে বললাম, 'সুচরিতা, সত্যিই আমি কোনওদিন ভাবিনি যে, এমনিভাবে তোমার সঙ্গে—' সুচরিতার চোখে কপট রাগ দেখে চটপট বলে ফেললাম, 'তোমার সঙ্গে ভাগ্য এমন চাতুরী করবে। সত্যি, কী বিপদেই না জড়িয়ে পড়েছ!'

'থাক, আর কথার জাল পাততে হবে না,' হেসে বলল সুচরিতা, 'এবার কাজের কথায় আসা যাক।'

'হ্যাঁ,' গলার স্বর গম্ভীর করে শুরু করলাম, 'নয়না কল্যাণী সম্পর্কে তুমি কী জানো, তাই খুলে বলো।'

'কিছুই না—। ওঁকে আমি চোখে দেখিনি কোনওদিন,' ঠোঁট বেঁকিয়ে জবাব দিল ও, 'শুনেছি গতবছর পর্যন্ত নাকি সাইরেন ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে রিসেপশনিস্টের কাজ করতেন। তারপর মানেকজী ওঁকে কবুতরে ডেকে পাঠান। মানেকজীর ইচ্ছে, নয়না কল্যাণী তাঁর সঙ্গেই রাজনীতি নিয়ে থাকুক।'

'তিনি কবুতরে কতদিন হল এসেছেন?'

'গতকাল সকালে। কিন্তু ওঁকে তুমি সন্দেহ করছ কেন?'

'না। সন্দেহ আমি প্রত্যেককেই করছি। কিন্তু ভাবছি যে, রণজিৎ সেনকে খুন করে নয়না কল্যাণীর কী লাভ?' হঠাৎই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'সু, চলো ফেরা যাক।'

ঘুরে দাঁড়াতেই আমার চোখ পড়ল একজন ছায়া-ছায়া মানুষের দিকে। আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে দেখেই সে দৌড়তে শুরু করল। দিনের আলোয় উজ্জ্বল আকাশের পটভূমিতে তাকে চেনা গেল না। তবু আমি ছুটলাম।

সুচরিতা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে আমাকে অনুসরণ করে আসতে লাগল।

দৌড়তে-দৌড়তে বনের বাইরে চলে এলাম। কিন্তু কই, কেউ তো কোথাও নেই! হতাশ হয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে বললাম, 'সুচরিতা, এই লোকটা কোন দলের, সমর বর্মন, না লালপাঞ্জা?'

উত্তরে ঠোঁট উলটে হাসল সুচরিতা।

দুজনে আবার কবুতরে ফিরে এলাম। বাড়িতে ঢুকতে যেতেই একটা ব্যাপার দেখে চমকে উঠলাম। বাঁদিক থেকে তৃতীয়? নাঃ, এ তো চার নম্বর জানলাটা দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে আরও দু-পা সরে গিয়ে দেখলাম, একেবারে বাঁদিকের জানলাটা আর দেখা যাচ্ছে না। তা হলে রাতে আমি কোন জানলা দিয়ে আলো দেখেছিলাম!

অবাক কাণ্ড! দু-চার পা এদিক-ওদিক সরলেই তিনটে জানলা থেকে চারটে হয়ে যাচ্ছে। কারণ, দ্বিতীয় সারির ঘরগুলোর একটা জানলা প্রথম সারির ঘরগুলোর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। যাকগে, কুছ পরোয়া নেই।

সুচরিতার দিকে ঘুরে প্রশ্ন করলাম, 'সু, ওই জানলাটা কার ঘরের?'

'কেন বলো তো! ওটা কিরণ শর্মার।'

'কিরণ শর্মার?' ঈষৎ ভাঁজ পড়ল আমার কপালে, 'তা হলে, আমার লিস্টে দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রীযুক্ত কিরণ শর্মা।' দৃঢ়স্বরে বললাম আমি।

আবার পা বাড়ালাম কবুতর লক্ষ্য করে।

ভেতরে গিয়ে দেখা হল মানেকজীর সঙ্গে। তিনি ক্রসওয়ার্ডের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'আসুন, আসুন—।'

আমি মৃদু হেসে তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। সুচরিতাও আমার পাশে বসল।

'মিস্টার মৈত্র,' আমাকে লক্ষ্য করে বললেন মানেকজী, 'আপনার জন্যে দোতলায় যে-ঘরটা ঠিক করে দিয়েছি, সেটা আপনার পছন্দ হয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ধন্যবাদ।'

এইবার ক্রসওয়ার্ডের দিকে ফিরলেন মানেকজী। বললেন, 'ওয়াডি, এ তো ভীষণ বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল।' মানেকজীর স্বচ্ছন্দ বাংলা শুনে অবাকই হলাম।

'কুমার রণজিৎ এখানে সাঙ্ঘাতিক জরুরি একটা কনফারেন্সে এসেছিলেন,' মানেকজী বলে চললেন, 'মিটিং তো হলই না, তার ওপর এই স্ক্যান্ডালাস ব্যাপার। কে, কেন, কুমার রণজিৎকে খুন করল আমি ভেবেই পাচ্ছি না, ক্রসবি।' পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালে, মুখে একবার বুলিয়ে নিলেন মানেকজী।

'দেখুন, আমি চেষ্টায় কোনওই ফাঁক রাখব না।' আমতা-আমতা করে বললেন ক্রসওয়ার্ড, 'কিন্তু এটা আমি বুঝতে পারছি না যে, আপনারা গুলির শব্দ পেলেন না কেন? অথচ মিস্টার মৈত্র বারোটা পঁয়তাল্লিশের সময় গুলির শব্দ পেয়েছেন।'

একটা সম্ভাবনার কথা মনে হওয়ায় আমি বললাম, 'ইন্সপেক্টর, হয়তো মার্ডারার কোনও কেমিক্যাল দিয়ে রাতে সবাইকে ড্রাগ করেছিল।'

'হতে পারে,' বললেন ক্রসওয়ার্ড, 'আমি এবার বাড়ির সবাইকে ডেকে একটা রিকোয়েস্ট করতে চাই। তা হল, কেউ যেন আপাতত, অন্তত দিনসাতেকের জন্যে, কবুতর ছেড়ে কোথাও না যান।'

'ঠিক আছে, আমি সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি কথাটা। মনে হয় কেউ এতে অরাজি হবেন না।' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মানেকজী। বললেন, 'ওয়াডি, যেমন করে হোক এই পলিটিক্যাল স্ক্যান্ডালের শেষ চাই আমি। কারণ,' ভুরু তুলে তাকালেন মানেকজী : '...এর সঙ্গে আমার আর প্রসাদজীর মানসম্মান জড়িয়ে আছে।' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মানেকজী।

মানেকজী চলে যাওয়ার পর আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ইন্সপেক্টর, আমি আজ কবুতর ছেড়ে যেতে চাই। কথা দিচ্ছি, কাল বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসব।'

ক্রসওয়ার্ড হাসলেন : 'যাবেন যান। কিন্তু মাইন্ড ওয়ান থিং—আমাদের যেন বডি ওয়ারেন্ট বের করতে না হয়।'

উত্তরে আমি স্যালুট করার ভঙ্গি করে সুচরিতার হাত ধরে বললাম, 'এসো, সুচরিতা।'

বাইরে এসে বললাম, 'সু, আমি এখন সাইরেন ইন্টারন্যাশনালে যাব। নয়না কল্যাণী সম্পর্কে খোঁজ নিতে। কাল আবার দেখা হবে। তুমি কিরণ শর্মার ওপর নজর রেখ। আমার জন্যে ভেব না। আর হ্যাঁ—তোমার গাড়িটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

আর দেরি না করে সুচরিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ি চড়ে রওনা দিলাম। উদ্দেশ্য, সাইরেন ইন্টারন্যাশনাল।

গাড়িতে যেতে-যেতে ভাবছিলাম। আলোটা জ্বলেছিল কার ঘরে? কিরণ শর্মা না নয়না কল্যাণী? কী করছিলেন তিনি ওই সময়? গুলির শব্দ শুনে কি ঘুম ভেঙেছিল ওঁর? কিন্তু আর কারও ঘুম ভাঙল না কেন? আর নয়না কল্যাণীর যদি কোনও গোপন ব্যাপার থাকে, তবে আমি নিশ্চিত যে, সাইরেন ইন্টারন্যাশনালে গিয়ে শুনব নয়না কল্যাণী নামে কেউই ওখানে কাজ করত না। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

শেষ পর্যন্ত সাইরেন ইন্টারন্যাশনালে।

রিসেপশনের ঘুমে ঢুলে পড়া হ্যাংলা মেয়েটিকে বললাম, 'ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাই—।'

একটু পরেই একটি লোক এসে আমাকে নিয়ে গেল ম্যানেজারের ঘরে। ঘরের দরজায় লেখা 'প্রাইভেট'।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম।

চেয়ারে বসে একজন প্রৌঢ়। মাথাজোড়া টাক। পাইপ টানছেন। তাঁকে বললাম, 'আমি নয়না নামে একটি মেয়ের খোঁজ জানতে এসেছি। সে আপনার হোটেলে কাজ করত।'

'হ্যাঁ, রিসেন্টলি ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। কোথায় ওর এক কীরকম ভাই না কে থাকে, তার কাছে যাবে বলছিল।'

জবাব শুনে একেবারেই দমে গেলাম আমি। এরকমটা ঠিক আশা করিনি। তা হলে কি কিরণ শর্মা...?

'থ্যাংক ইউ, ম্যানেজারসাহেব,' বলে নড করে বেরিয়ে এলাম আমি। তার মানে নয়না কল্যাণী মানেকজীর সত্যিকারের রিলেটিভ!

হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এসে গাড়ি স্টার্ট করলাম। সুচরিতাকে সব খুলে বলতে হবে। একবার ভালো করে আলোচনা করা দরকার। ঘড়ি দেখলাম, রাত তিনটে।

কবুতরে পৌঁছেই দেখি সুচরিতা গেটের বাইরে উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থামিয়ে বাইরে বেরোতেই দৌড়ে এল ও। বলল, 'কাঞ্চন, সর্বনাশ হয়েছে!' বলে ও আমাকে হাত ধরে নিরিবিলি গাছ-গাছালির দিকটায় টেনে নিয়ে চলল। ভোরের হালকা আলো তখন ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীতে।

কিছুদূর গিয়ে আমি বললাম, 'কী হয়েছে?'

হাঁফাতে-হাঁফাতে বলতে শুরু করল সুচরিতা, 'ইব্রাহিমকে খুঁজে পেয়েছে ওরা!'

'তাই নাকি?' মুখে এ-কথা বললেও মনে-মনে রেলগাড়ি ছুটিয়ে চিন্তা করছিলাম, এরপর কী করা উচিত।

'হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর ক্রসবি খোঁজ করেছিলেন যে, তুমি এসেছ কি না,' বলে চলল সুচরিতা, 'আর কিরণ শর্মাকে দেখলাম লাইব্রেরি-ঘরের বইপত্তর ঘেঁটে-ঘেঁটে দেখছেন। আমি ঢুকতেই মৃদু কাষ্ঠহাসি হেসে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন।'

হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেল সুচরিতা, বলল, 'ওহ্ হো, আমি তো জিগ্যেস করতেই ভুলে গেছি। ওদিকের খবর কী?'

বিষণ্ণ হাসি হেসে বললাম, 'শিকে ছেঁড়েনি। একদম বাজে খবর। নয়না কল্যাণী সত্যি কথাই বলেছেন, সাইরেনেই কাজ করতেন উনি। এখন আমার মনে হচ্ছে যে, সে-রাতে আলো বোধহয় কিরণ শর্মার ঘরে জ্বলছিল।' কথা বলতে-বলতেই একটা দেবদারু গাছের দিকে চোখ গেল আমার। তখনই দেখলাম গাছের গুঁড়ির ওদিক থেকে কারও জামার একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই সেই লোকটা।

পা টিপে-টিপে এগোলাম। সুচরিতা কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি মুখে আঙুল তুলে ওকে ইশারায় জানালাম চুপ করে থাকতে। তারপর গিয়ে আচমকা গাছের ওপিঠে হাজির হলাম।

গাছের আড়ালে যে-লোকটি নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়েছিল, সে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। হাসবার চেষ্টা করল।

'আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না,' ঠান্ডা স্বরে বললাম আমি, 'দয়া করে নিজের পরিচয়টা যদি দেন...।'

'আমি—আমি এখানে নতুন এসেছি,' কর্কশ স্বরে থেমে-থেমে সে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না কোন দিকে পড়বে বাড়িটা...।'

আমি সুচরিতার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালাম। তারপর লোকটিকে উদ্দেশ করে বললাম, 'আসুন আমার সঙ্গে। কোথায় বাড়ি আপনার—?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল লোকটি। তারপর বলল, 'ওই দিকটায়—' বলে একটা দিক দেখাল সে।

আমি তার এই এলোমেলো কথায় ক্রমশ অবাক হচ্ছিলাম। হয়তো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ লোকটি 'থ্যাংক ইউ অ্যান্ড গুড বাই' বলে হনহন করে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঠিক তখনই আমার মাথায় এল ব্যাপারটা। এই লোকটাই সেই লোকটা নয় তো! নিশ্চয়ই, কোনও সন্দেহই নেই! লোকটার চেহারা মনে করার চেষ্টা করলাম। চোখে সবুজ সানগ্লাস, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, সরু গোঁফ, কপালে বলিরেখা।

চিন্তার জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে আবার হাঁটতে শুরু করলাম কবুতরের দিকে।

সুচরিতাকে বললাম, 'সু, আজ রাতে আমি বোধহয় কবুতরে থাকতে পারব না।'

'কেন, কেন?' অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠল সুচরিতা।

আমি হাসলাম। সুচরিতা এতই চঞ্চল হয়ে উঠল যে, হাসি চাপতে পারলাম না।

'কেন, আবার হাসির কী হল?' অবাক হয়ে বলল সুচরিতা।

'কিছু না। আমি একবার হোটেল কন্টিনেন্টালে যাব। খোঁজ নেব যে, ইব্রাহিমের সঙ্গে কেউ ওখানে দেখা করতে যেত কি না...।'

'ও, তা বেশ তো—।' গম্ভীর গলায় বলল সুচরিতা।

'প্লিজ সু, বোঝার চেষ্টা করো। কোনও ভয় নেই। আজ রাতে আর কোনও বিপজ্জনক ঘটনা ঘটবে না—তুমি শুধু-শুধু চিন্তা করছ। তা ছাড়া ইব্রাহিমের ব্যাপারটার একটা খোঁজ নেওয়া দরকার।'

একটু থেমে সুচরিতা বলল, 'কাল কখন ফিরবে?'

'সকালেই।' জোর দিয়ে বললাম আমি।

কবুতরের বাইরের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম। সুচরিতা কবুতরের বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল, তাই আমিই লক্ষ করলাম ব্যাপারটা।

দেখলাম, কিরণ শর্মা উত্তেজিতভাবে ক্রসওয়ার্ডকে কী যেন বোঝাচ্ছেন, আর ক্রসওয়ার্ড চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ছেন।

একটু পরে ক্রসওয়ার্ড একাই এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে, বললেন, 'মিস্টার মৈত্র, আমি আপনার সঙ্গে একটু গোপনে আলোচনা করতে চাই।'

সঙ্গে-সঙ্গে সুচরিতার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল।

আমি ওর দিকে ফিরে হেসে অভয় দিলাম, বললাম, 'কোনও ভয় নেই, সু, তুমি যাও।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলে গেল ও।

'মিস্টার মৈত্র,' ক্রসওয়ার্ডের কাঠ-খোদাই মুখে কোনও অভিব্যক্তি লক্ষ করা গেল না, 'আমরা একটা ডেডবডি পেয়েছি। তার পরিচয়ও আমরা জেনেছি। হোটেল কন্টিনেন্টালের বেয়ারা ছিল সে। হোটেলের ম্যানেজারও আমাদের আপনার সেই চিঠি চুরি করার কথা বলেছে। সবই ঠিক আছে, শুধু একটা ব্যাপারে একটু খটকা দেখা দিয়েছে। যেখানে বডিটা পাওয়া গেছে, সেখানকার জনাদুয়েক লোক বলেছে যে, সে-রাতে তারা নাকি ভারি অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিল। ওরা ড্রিঙ্ক করে ফিরছিল বলে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি...ভেবেছে দেখার ভুল।' অর্থপূর্ণভাবে কথা শেষ করলেন ইন্সপেক্টর।

'কী, কী দেখেছিল ওরা?' আমি জানতে চাইলাম।

'আপনাকে একটা গাছ থেকে নামতে দেখেছিল। আমি ওদের আপনার ফটো দেখাতেই ওরা আইডেন্টিফাই করেছে। এরপর সেই গাছে উঠে আমরা এটা পেয়েছি।' বলে পকেট থেকে ব্রাউন পেপারে মোড়া ছুরিটা বের করলেন তিনি।

এরপর চুপ করে থাকার মানে হয় না। তাই সব খুলে বললাম ওঁকে। মৃতদেহ গুম করার কারণটাও খুলে বললাম। জানি না তিনি বিশ্বাস করলেন কি না। আমার বলা শেষ হলে ক্রসওয়ার্ড শুধু মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলেন, 'হুঁ—।'

তারপর একটু থেমে দ্বিধাগ্রস্তভাবে আমি বললাম, 'ইন্সপেক্টর, আমাকে আজ রাতে একটা জায়গায় যেতে হবে। কাল দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসব।'

'যাবেন যান, কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন, দিল্লি পুলিশের ডিকশনারিতে ইমপসিবল্ বলে কোনও শব্দ নেই—' বলে হনহন করে এগিয়ে গেলেন ক্রসওয়ার্ড।

ওঁর দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললাম, 'মিস্টার ক্রসওয়ার্ড, তুমি যদি জানতে, আমি কে, তবে—।'

কাঞ্চনবাবু, সুচরিতা চৌধুরী কিন্তু কবুতরে থেকে গেলেন। আপনি তো যাওয়ার আগে বললেন, আজ রাতে কবুতরে আর কিছু হবে না। কিন্তু শুনুন—হ্যাঁ, আজ রাতেই একটা ব্যাপার হবে। সম্ভবত মাঝরাতে—। সুচরিতাদেবী বিপদে পড়তে পারেন। তবু আপনি যাবেন? থেকে গেলে পারতেন কিন্তু।

যাকগে, নিয়তিকে তো আর কেউ রুখতে পারে না! ভীষণ কাণ্ড হবে একটা—সত্যি বলছি—সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা হবে—!

এ রহস্যের শেষ কোথায়? নিজের ঘরে শুয়ে-শুয়ে এ কথা ভাবছিল সুচরিতা। রাত প্রায় দেড়টা। আশ্চর্য! কুমার রণজিৎ খুন হওয়ার রাতে গুলির শব্দ কেউ শুনল না কেন! তবে কি রাতে ওরা যে-ড্রিঙ্কস নিয়েছিল তাতেই কোনও স্লিপিং ড্রাগ মেশানো ছিল? কিন্তু কে মেশাল! হঠাৎ...।

ঠিক সেই মুহূর্তে সুচরিতার কোষে-কোষে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল। পায়ের শব্দ না! অন্ধকারেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ও। কোনদিক থেকে শব্দটা আসছে ঠাহর করতে পারল না। তাড়াতাড়ি পা টিপে-টিপে ঘর ছেড়ে করিডরে বেরিয়ে এল। করিডর নিঝুম নিস্তব্ধ। কেউ কোথাও নেই।

আবার শব্দ হল একটা। নিশ্চয়ই নীচের লাইব্রেরি-ঘরে। কেউ তা হলে আছে নাকি ওখানে?

পা টিপে-টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে লাইব্রেরির সামনে এসে দাঁড়াল সুচরিতা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। এগিয়ে এসে চাবির ফুটোয় চোখ রাখল। এ কী!

লাইব্রেরি-ঘরের গভীর অন্ধকারে শুধু একটা টর্চলাইটের আলো ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ পাশ থেকে কেউ একজন সরে দাঁড়ানোয় চাবির ফুটো দিয়ে আর কিছু দেখা গেল না।

তবে কি লাইব্রেরি-ঘরে চোর ঢুকেছে? কিন্তু ওর পক্ষে তো একা কিছু করা সম্ভব নয়! চিন্তা করে দেখা গেল সাহায্য করার মতো একজনই আছে কবুতরে। সে তরুণ সান্যাল।

অতএব সিঁড়ি দিয়ে উঠে তরুণের ঘরের কাছে এসে দরজায় টোকা দিল সুচরিতা।

'তরুণ—।'

একটু পরে ঘুম চোখে এসে দরজা খুলল তরুণ সান্যাল। চেঁচিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে সুচরিতা বলে উঠল, 'শ—স্-স্। চুপ! নীচের লাইব্রেরিতে মনে হয় চোর ঢুকেছে।'

'কী! চোর!' তরুণের ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি।

'আস্তে,' ফিসফিস করে বলল সুচরিতা, 'তুমি রেডি হয়ে নাও—আমরা দুজনে ঢুকব ও-ঘরে।'

'দাঁড়াও।' বলে ঘরের কোনা থেকে একপাটি লোহার নাল লাগানো জুতো

তুলে নিল তরুণ। বলল, 'চলো, এই জুতোর এক ঘা খেলে চোরবাবাজীকে আর উঠে দাঁড়াতে হবে না—।'

নিঃসাড়ে চুপিচুপি ওরা দুজনে এসে দাঁড়াল লাইব্রেরির সামনে।

'ভেতরে ক'জন আছে?' ফিসফিস করে জিগ্যেস করল তরুণ।

'কে জানে! বোধহয় দু-তিনজন!' অবহেলাভরে মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল সুচরিতা।

'আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে তুমি ভেতরে ঢুকে আলোর সুইচটা অন করে দেবে—।' বলে জুতোটাকে বাগিয়ে ধরে এক ঝটকায় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল তরুণ।

ভেতরে টর্চের আলো তখনও দেওয়ালের গায়ে ঘুরছিল। দরজা খোলার শব্দে টর্চধারী লোকটি সচকিত হওয়ার আগেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তরুণ। ওদের দুজনের ঝটাপটিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সুচরিতা—ওই অন্ধকারেই। ঠিক ওই সময়ই কে যেন মনে হল ওর পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। আর কিছু ভাববার আগেই তরুণের চিৎকার ভেসে এল : 'সুচরিতা, আলোটা জ্বালাও—শিগগিরই—।'

সুচরিতা সুইচের দিকে পা বাড়াতেই দেখা গেল একটি ছায়ামূর্তি এক ছুটে লাইব্রেরির খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে লাফিয়ে সুরকি ঢালা রাস্তা দিয়ে দৌড়ে পালাল।

এই দেখে আর আলো না জ্বালিয়ে লোকটির পিছন-পিছন ধাওয়া করে বাইরে বেরিয়ে এল সুচরিতা।

দৌড়ে যখন ও কবুতরের গেটে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময় ওর সঙ্গে একজনের ধাক্কা লাগল।

'লোকটি পালিয়েছে—।' গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল কারও।

চোখ তুলে তাকাল সুচরিতা। ওর সামনে টেরিন টি-শার্ট আর ফুলপ্যান্ট পরে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি শ্রীকিরণ শর্মা।

দারুণ অবাক হয়ে গেল সুচরিতা। এই রাতেও টিপটপ ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে আছেন শর্মাসাহেব!

'লোকটি পালিয়েছে, মিসেস চৌধুরী, আর ফলো করে লাভ নেই।' দ্বিতীয়বার বললেন তিনি।

'ও—।'

একটা কথা ভাবছিল সুচরিতা। সত্যি যদি তাই হয়! হয়তো অসম্ভব কল্পনা, কিন্তু অসম্ভবও তো সময়ে-সময়ে সম্ভব হয়।

'চলুন, শর্মাসাব, কবুতরে ফিরে যাওয়া যাক,' বলে দুজনে ফিরে চলল

কবুতরের দিকে।

বাড়ির সবাই তখন লাইব্রেরি-ঘরে এসে ভিড় করেছেন—একমাত্র নয়না কল্যাণী ছাড়া। ওঁর নাকি অনিদ্রা রোগ আছে। তাই ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোন। বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়লেও ঘুম নাকি ওঁর ভাঙে না—মানেকজী জানালেন।

তরুণের কপালে একদিকটায় ছড়ে গেছে। সবাইয়ের ননস্টপ প্রশ্নের উত্তরে সবই খুলে বলল ওরা। কিন্তু কারা, কেন এসেছিল, কিছুই জানা গেল না।

অবসন্ন মনে নিজের ঘরে ফিরে চলল সুচরিতা। লোকটা ঘরের দেওয়ালে আলো ফেলে কী দেখছিল? ইস, কাঞ্চন থাকলে কত ভালো হত!

কবুতরের রহস্য কি এখনও শেষ হয়নি? কে জানে, এরপর কবুতরে কোন অধ্যায় অভিনীত হবে!

পরদিন সকালেই ফিরে এলাম আমি। আমাকে দেখেই প্রথমে সুচরিতার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। ছুটে এগিয়ে এল আমার কাছে। ওর চোখে আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টি।

আমি ওকে আশ্বাস দেওয়ার জন্যে কাছে টেনে নিলাম। ওর কানে-কানে প্রায় ফিসফিস করে বললাম, 'কী হয়েছে, সু, কী হয়েছে—?'

'আমার ভয় করছে—ভীষণ ভয় করছে।' কাঁপা-কাঁপা স্বরে জবাব দিল সুচরিতা।

'আরে ভয় কী—' থেমে-থেমে বললাম আমি, 'আমি থাকতে তোমার গায়ে যে হাত দেবে তার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেব। কী হয়েছে—?'

শেষ দিকে আমার গলা পালটাতে দেখে ও একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর ধীরে-ধীরে বলল সব। কীভাবে রাতে চোর ঢুকেছিল লাইব্রেরিতে, তারপর তাড়া করতে গিয়ে কিরণ শর্মার সঙ্গে ধাক্কা—ইত্যাদি-ইত্যাদি।

সব শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম আমি। তারপর বললাম, 'সু, তোমার পাশ দিয়ে অন্ধকারেই যে কেউ বেরিয়ে গিয়েছিল এ-ব্যাপারে তুমি কি শিয়োর?'

'তাই তো মনে হয়েছিল আমার...।'

'হুঁ—। তার মানে বাইরের কারও সঙ্গে ভেতরের কেউ হাত মিলিয়েছে।' একটু চিন্তা করে বললাম আমি।

তক্ষুনি সুচরিতা এমন একটা কথা বলল যে, আমি সাঙ্ঘাতিকভাবে চমকে উঠলাম। ও বলল, 'বাইরের লোক হওয়ার কী দরকার? ভেতরের দুজন হলেও বা আপত্তি কিসের! যদি কিরণ শর্মাই সেই বাইরের লোক হয়?'

'কিন্তু, এ কী করে সম্ভব!'

'তুমি না একটা আস্ত বোকা! তোমাকে বললাম না, কিরণ শর্মা একদম ড্রেস্‌ড-আপ হয়ে ছিলেন। মনে করো কিরণ শর্মা জানলা দিয়ে লাফিয়ে দৌড়লেন। আমি তাড়া করলাম। ধরতে পারলাম না, কিন্তু একটু পরেই তো কবুতরে ওঁর অ্যাবসেন্স ধরা পড়বে, তখন! তাই দৌড়ে কবুতরের গেট পার হয়েই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। বললেন যে, লোকটি পালিয়েছে।' খুশি-খুশি মুখে চুপ করল সুচরিতা।

'জিনিয়াস! সু, তুমি একটা জিনিয়াস।' উচ্ছ্বাসে বললাম আমি। কিন্তু পরমুহূর্তেই গলার স্বর খাদে নামিয়ে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু তোমার পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে কে বেরিয়ে গিয়েছিল?'

'কী জানি, আমি বুঝতে পারিনি। তবে কী যেন একটা মনে করেও করতে পারছি না...।'

'কী? কী কথা?' আমি জানতে চাইলাম।

'ঠিক মনে করতে পারছি না। হয়তো পরে মনে পড়বে।'

এইবার আমি মনে-মনে একটা প্ল্যান ছকে ফেললাম। প্রশ্ন করলাম সু'কে, 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় যে, যারা এসেছিল, তারা তাদের কাজ গুছিয়ে নিতে পেরেছে?'

'উহুঁ—' সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল সুচরিতা।

'তার মানে আবার তারা আসবে—' দৃঢ়স্বরে বললাম আমি, 'হয় আজ রাতে, নয়তো কাল রাতে, নয় আগামী আর কোনও রাতে। তা হলে শুরু হোক আজ রাত থেকেই।'

'কী শুরু হবে?' চোখ নামিয়ে প্রশ্ন করল সুচরিতা।

'যাকগে...পরেই শুনবে—দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর। হ্যাঁ, ভালো কথা—তরুণ সান্যাল কবুতরে আজ থাকছে তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ইব্রাহিমের ব্যাপারটার কী হল?'

'কিস্যু না। যে-অন্ধকারে ছিলাম এখনও সেই অন্ধকারে। ইব্রাহিমের সঙ্গে তেমন কেউ গোপনে দেখা করতে আসত না।' একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আমার বুকের পাঁজর থেকে : 'চলো, ভেতরে যাওয়া যাক।' বলে দুজনে কবুতরে ঢুকলাম।

সেখানেই দেখা হল ইন্সপেক্টর ক্রসবির সঙ্গে। আমাকে দেখে হাসলেন, বললেন, 'শুনেছেন তো, গত রাতে কবুতরে চোর এসেছিল!'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম আমি।

এতক্ষণ প্রসাদজীকে লক্ষ করিনি। তিনি ইন্সপেক্টরের পেছনেই দাঁড়িয়ে

ছিলেন। বললেন, 'মিস্টার মৈত্র, আপনার সব কথাই আমি শুনেছি। আশা করি কবুতরে থাকতে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।'

'না, না,' বাধা দিয়ে বলে উঠলাম আমি, 'কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।'

প্রসাদজী চলে গেলেন।

ইন্সপেক্টর আমার দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'কাঞ্চনবাবু, গতরাতে আপনি কবুতর ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন?'

আমি সব খুলে বললাম। কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হলেন না বলেই মনে হল। তিনি কি আমাকেই রাতের আগন্তুক বলে সন্দেহ করছেন নাকি? যাক গে, আমি আর সুচরিতা কোনও কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর তরুণ আর সুচরিতার সঙ্গে গোপনে আলোচনা করলাম। ঠিক হল, সুচরিতা একটা আলমারির পেছনে লুকিয়ে থাকবে, ঘরে কেউ ঢুকলেই আলো জ্বেলে দেবে। আর আমি থাকব টেবিলের পেছনে। সব শেষে তরুণ থাকবে দরজার কাছে—যাতে দরজা দিয়ে কেউ পালাতে না পারে। রাত বারোটা থেকে আমরা অপেক্ষা শুরু করব ঠিক করলাম। আমরা ছাড়া আর কেউ যেন কিছু জানতে না পারে, এ-কথা বারবার করে বলে চলে এলাম নিজের ঘরে। সটান গিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

রাত বারোটা বেজে এক মিনিট। অজ্ঞান কবুতরে জেগে আছি শুধু আমরা তিনজন—আমি, তরুণ আর সুচরিতা।

পা টিপে-টিপে লাইব্রেরিতে ঢুকলাম আমরা। ঘরে **জমাট অন্ধকার**। আমরা যার-যার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। তরুণ সঙ্গে এনেছে একপাটি নাল লাগানো জুতো। আমার পাঁচ আঙুলে আটকানো একটা 'নাক্‌ল ডাস্টার'। সারা ঘর অন্ধকার। শুধু তিনটে কাঁচের জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল ভেতরে।

দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছিলাম আমি। আজ হয়তো আমাদের প্রতীক্ষা নিস্ফল হবে। তবু আশা—। বাঁ হাতের রেডিয়াম ডায়ালে চোখ নামালাম। পৌনে একটা। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছিল।

এইভাবে কতক্ষণ যে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। হঠাৎই যেন সুরকি-ঢালা পথে কারও সতর্ক পায়ের শব্দ আমার কানে এল। শরীরের সবকটা স্নায়ু যেন নিঃশব্দ চিৎকারে গলা ফাটিয়ে বলতে লাগল, 'এসেছে। সে এসেছে!'

একটু পরেই একটি ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল জানলায়। দম বন্ধ করে চরম মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। ধীরে-ধীরে জানলা টপকে ঘরের মধ্যে

নেমে দাঁড়াল সে। একবার এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর এক পা এগোতেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর।

পরমুহূর্তেই ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিল সুচরিতা। তরুণ এগিয়ে এসে কলার ধরে এক হ্যাঁচকায় তুলে দাঁড় করাল লোকটিকে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম আমি। একী! এ যে সেই রহস্যময় কালো পোশাক পরা লোকটি।

এগিয়ে গিয়ে তাকে উদ্দেশ করে বললাম, 'স্যার, নিজের বাড়ি খুঁজতে এসে আপনাকে যে এত বিপদে পড়তে হবে তা বোধহয় ভাবেননি!'

লোকটি গম্ভীর মুখে তাকাল আমার দিকে। ইতিমধ্যে লাইব্রেরিতে প্রায় সবাই এসে হাজির হয়েছেন। শ্রী নরসিংহ আমাকে লক্ষ করে বললেন, 'মিস্টার বোস, হচ্ছে এসব ব্যাপার কী? মাঝরাত্রে যত সব বিড়ম্বনা।'

আমি হাসলাম, ওঁকে নকল করে বললাম, 'বোস নয়, মৈত্র। দেখুন না নিজেই হয়েছে কি।'

সর্বেশ্বর রায় নামধারী ভদ্রলোক চোরের মতো দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন নৈশ আগন্তুকের দিকে।

সকলের দিকে একপলক দেখে জামাকাপড় ঝেড়ে মুখ খুললেন আমাদের নৈশ অতিথি। আমাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনাদের সবাইকে জানাই যে, আমার নাম কিষাণ আপ্তে—দ্যাট ইজ, এজেন্ট জেড। সি. বি. আই. থেকে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।'

এ-কথায় ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। বিস্ময়ের অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল সবাইয়ের মুখ দিয়ে।

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে মিস্টার আপ্তে বলে চললেন, 'আমি এখানে এসেছি সমর বর্মনকে গ্রেপ্তার করার জন্যে। নামটা আপনাদের সকলের কাছেই বোধহয় পরিচিত। আমি দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, কবুতরে যে-ক'জন হাজির আছেন, তাদের মধ্যে একজন অবশ্যই সমর বর্মন। বর্মনের ছদ্মবেশ ধরার ক্ষমতা অবিশ্বাস্য। সে আমার ছদ্মবেশ ধরে হাজির হয়েও আপনাদের ধোঁকা দিতে পারে। এই আশ্চর্য চোর এবং ব্ল্যাকমেলারটিকে ধরা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এখন যেহেতু সে কবুতরে আছে, তাই আমাদের কাজ একটু সহজ হয়ে পড়েছে।

'সমর বর্মন কবুতরে এসেছে সম্ভবত হীরের নেকলেসের জন্যে। গতবছর সিরাজনগরের মন্ত্রী সুরেন্দ্র পালিত একটা মিটিং-এ কবুতরে এসেছিলেন। আমরা খবর পেয়েছি যে, তিনি একটি দামি নেকলেস এখানে লুকিয়ে রেখে যান। সেটার খবর বর্মন জেনে বসেই পায়। আমরা আন্দাজ করেছিলাম যে, ওটা হাতানোর জন্যে সে কবুতরে আসবেই। তাই এতদিন আমি ছদ্ম-পরিচয়ে

কবুতরের আশেপাশে ঘুরেছি—' বলে আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন তিনি। তারপর সুচরিতার দিকে ফিরে বললেন, 'ম্যাডাম, গত রাতেও আমি এসেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল এই লাইব্রেরিতে লুকিয়ে রাখা হীরের নেকলেসটা উদ্ধার করা। আমি চাইনি যে, সবাই এই ব্যাপারটা জানুক। যা হোক, আগামীকাল আমি ইন্সপেক্টর ক্রসবির সঙ্গে দেখা করছি। এবার আমি বর্মনকে ধরবই। সে আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।' তাঁর চোখ জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

সর্বেশ্বর রায় বললেন, 'মিস্টার আপ্তে, আমি আগামীকাল কবুতর ছেড়ে যেতে চাই। তা না হলে আমার প্রায় পঞ্চাশহাজার টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'সেটা আপনি ক্রসবিকেই বলবেন—।' জানালেন এজেন্ট জেড।

প্রসাদজী মিস্টার আপ্তের জন্যে ওপরে একটা ঘরের ব্যবস্থা করলেন। সবাই লাইব্রেরি ছেড়ে পা বাড়ালেন নিজের-নিজের ঘরের দিকে।

সুচরিতাকে নিয়ে ওপরে ওঠার সময় শুধু শুনলাম, শ্রীনরসিংহ নিজের মনেই বলছেন, 'খুবই ঘটছে আশ্চর্য এখানে ব্যাপার—।'

পরদিন সকালে উঠে চুল আঁচড়াতে যেতেই সাঙ্ঘাতিক অবাক হলাম আমি। আয়না দিয়েই চোখে পড়ল বাণ্ডিলটা। তারপর তাকালাম টেবিলের ওপর। এই তো! এই তো সেই চিঠির বাণ্ডিলটা! সুচরিতা চৌধুরীর নাম লেখা সেই চুরি যাওয়া চিঠিগুলো!

হঠাৎই বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটা কথা মনে এল। সুরেন্দ্র পালিতের লেখা পাণ্ডুলিপির হাতের লেখা আর এই চিঠিগুলোর হাতের লেখা একই। তার মানে এই চিঠির লেখক শ্রীযুক্ত পালিতই। হয়তো এই চিঠিগুলোতে কোনও গোপন ইঙ্গিত আছে। এই যে, কবুতর থেকে লেখা চিঠিটা। এটা আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হলেও, হয়তো এর সাহায্যেই পালিতসাহেব লুকনো নেকলেসের সন্ধানটা জানাতে চেয়েছেন।

এক দৌড়ে নীচে নেমে গিয়ে কিষাণ আপ্তেকে সবকিছু খুলে বলে আমার সন্দেহের কথা জানালাম।

তিনি প্রসাদজীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমার কথা শুনে বললেন, 'মিস্টার মৈত্র, আপনি যা বলেছেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। আমি এক্ষুনি থানায় যাচ্ছি। এখানকার সাইফার রিডারকে অনুরোধ করব এগুলো ডিসাইফার করার জন্যে।' বলেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে চিঠিগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি প্রসাদজীর সঙ্গে আলোচনা শুরু করলাম। বললাম, 'আচ্ছা প্রসাদজী,

আপনার বাড়িতে কোনও গুপ্তপথ আছে কি?'

'না তো।' জানালেন প্রসাদজী।

'কোনওকালেই ছিল না?' গভীর আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম আমি।

উত্তরে প্রসাদজী জানালেন যে, অনেক আগে একটা সুড়ঙ্গপথ ছিল ওই লাইব্রেরিতেই। কিন্তু পরে সেটা নষ্ট হয়ে যায়।

আমি আর প্রসাদজী উঠে রওনা হলাম লাইব্রেরির দিকে। মাঝপথেই দেখা হল সুচরিতার সঙ্গে। ওকে সব কথা বললাম। শুনে অবাক হয়ে গেল ও। আমরা তিনজনে গিয়ে হাজির হলাম লাইব্রেরিতে।

প্রসাদজী এগিয়ে গেলেন দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে। ছবিটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে দেওয়ালের সেই অংশে একটু চাপ দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটা আলমারির পাশ থেকে দেওয়ালের কিছুটা অংশ নিঃশব্দে সরে গেল। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। অতি সাধারণ একটা সুড়ঙ্গপথ। দেখে অনেক পুরনো বলেই মনে হয়। প্রায় কুড়ি গজ যাওয়ার পর দেখা গেল পথ সম্পূর্ণ বন্ধ। সুড়ঙ্গের দেওয়াল অত্যন্ত জীর্ণ হওয়ায় ইটের গা থেকে চুন-বালি সব খসে-খসে পড়ছে।

মিনিটদশেক পর আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। প্রসাদজী বললেন, 'মৈত্রসাব, কিছু ব্যাপারই আমার মাথায় ঢুকছে না। কোত্থেকে কী সব হচ্ছে—।'

এমন সময় লাইব্রেরির দরজায় হাজির হলেন এজেন্ট জেড। তাঁর মুখ খুশিতে ভরপুর।

আমাদের দেখেই বললেন, 'সব জেনেছি আমি। আপনি ঠিকই বলেছিলেন, মিস্টার মৈত্র, কবুতরের নাম লেখা চিঠিটাই আসল। সেটা ডিকোড করা গেছে। এই দেখুন—।' বলে একটা কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি।

কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলাম। তাতে লেখা—

আট বাঁ—সাতটা ইট—পাশে তিনটে—কাগজ।
গজ উপরে

—সুরেন্দ্র

'এ তো জলের মত স্পষ্ট!' বলে উঠলাম আমি, 'তার মানে সুড়ঙ্গপথ ধরে আট গজ গিয়ে বাঁদিকের দেওয়ালে দেখতে হবে। মেঝে থেকে সাতটা ইট ওপরে গিয়ে তিনটে ইট পাশে—ব্যস, তা হলেই পাওয়া যাবে।'

'আমিও ঠিক তাই ভেবেছি।' বললেন কিষাণ আপ্তে, 'চলুন, আর দেরি করে লাভ কী!'

'শুরু করা যাক—।'

প্রসাদজী একটা মাপার ফিতে নিয়ে এলেন। মাপজোখ করে কাজ শুরু করলাম আমরা চারজন। সাতটা ইট ওপরে আর তিনটে ইট পাশে যেতেই একটা আলগা ইট চোখে পড়ল। পকেট থেকে ছোট্ট ছুরি বের করে ইটটাকে বের করে নিলাম।

অন্ধকার একটা খুপরি। আনন্দে উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে গেল যেন। কিষাণ আপ্তে চটপট হাত ঢুকিয়ে দিলেন খুপরির ভেতরে।

একটু পরেই হাত বের করে নিলেন। তাঁর হাতে একটা কাগজ।

'তাহলে কি কেউ আমাদের আগেই এ-জায়গার সন্ধান পেয়েছে!' উঁচু গলায় বললাম আমি।

'মনে তো হয় না।' জানালেন **এজেন্ট জেড**। কাগজটা মেলে ধরলেন চোখের সামনে। কী আশ্চর্য! তাতে শুধু দেখা যাচ্ছে :

গ গ গ গ গ
গ গ গ গ গ

দেখে ভীষণ অবাক হলাম আমি। এরকম তিক্ত রসিকতার অর্থ কী!

কিষাণ আপ্তেকে লক্ষ করে বললাম, 'মিস্টার আপ্তে, আপনি কি এর অর্থ বুঝতে পারছেন?'

'উঁহু—' মাথা ঝাঁকালেন এজেন্ট জেড।

প্রসাদজী বললেন, 'মিস্টার মৈত্র, চলুন বাইরে যাওয়া যাক।'

বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা। প্রসাদজী গুপ্তপথটা বন্ধ করে দিয়ে ছবিটাকে আবার যথাস্থানে টাঙিয়ে রাখলেন।

এমন সময় লাইব্রেরিতে এসে ঢুকলেন কিরণ শর্মা ও ক্রসওয়ার্ড। কিষাণ আপ্তের হাতে চিরকুটটা দেখে এক লাফে এসে দাঁড়ালেন সামনে, বললেন, 'দেখি, দেখি।' বলে আর দেওয়ার অপেক্ষা রাখলেন না। একরকম ছিনিয়েই নিলেন ওটা।

জেড বাধা দিলেন না।

আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম কিরণ শর্মার মুখের দিকে। হঠাৎ লক্ষ করলাম যে, একটা খুশির ঝিলিক লহমার জন্যে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর মুখে। তারপর অপেক্ষাকৃত গম্ভীর মুখ করে বলে উঠলেন, 'ভারি অন্যায়। এরকম রসিকতা করা ভারি অন্যায়।'

ক্রসওয়ার্ডও দেখলেন কাগজটা। কিন্তু কিছু বুঝলেন বলে মনে হল না।

'এসবই সমর বর্মনের কারসাজি,' দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন জেড : 'তাকে

একবার হাতের মুঠোয় যদি পাই...।'

'আমি যাচ্ছি—একটু কাজ আছে।' বলে সঙ্গে-সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন শর্মা। আমরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর চলার পথের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভাঙলাম আমি, 'মিস্টার আপ্তে, এই কিরণ শর্মা যদি কুমার রণজিৎকে খুন করে থাকেন, তা হলে আমি বিন্দুমাত্রও আশ্চর্য হব না।'

দুজন অফিসিয়াল হাঁ করে চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। সুচরিতা আপনমনেই নখ খুঁটতে থাকল।

ওপরে উঠে প্রথম ঘরটায় উঁকি মেরে দেখি শ্রীসর্বেশ্বর রায় গোছগাছ শুরু করে দিয়েছেন। আমি পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে গেলাম। ঘরে ঢুকতেই দেখি একজন চাকরগোছের লোক বসে রয়েছে। আমি তাকে দেখে অবাক হলাম। এ যে কুমার রণজিতের নেপালী চাকরটা!

আমাকে দেখেই লোকটি হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলল, 'বাবু, আমার সাহেবকে যে খুন করেছে তাকে আমি শেষ করব। আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে নিন—আমি আপনার কেনা হয়ে থাকব।' বলতে-বলতে লোকটি কোমর থেকে হঠাৎই একটা বাঁকানো ছোরা বের করল। ওর মুখ জিঘাংসায় বিকৃত হয়ে উঠল।

আমি ভাবলাম, **লোকটি আমাকেই খুনী ভাবছে না তো!** হয়তো আমার বিশ্বাসভাজন হয়ে তারপর আমাকেই খুন করতে চায়।

মুখে বললাম, 'ঠিক আছে। তোমার কোনও চিন্তা নেই। পুলিশ কুমারের হত্যাকারীকে ধরে ফাঁসিতে ঝোলাবেই।'

জানি না, সে আমার কথা কতটুকু বিশ্বাস করল। কিন্তু ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার যে-কোনও কাজে দরকার হলেই আমাকে বলবেন। আপনার জন্যে জান হাসিল।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আমি হাঁফ ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর এসে দাঁড়ালাম জানলার কাছে। এই জানলা দিয়ে কবুতরের পেছনদিকটা চোখে পড়ে। ও কী! কিরণ শর্মা না? পেছনদিকের গোলাপ বাগানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ব্যাপার কি **জানার জন্যে** তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আমি রওনা দিলাম বাগানের উদ্দেশে।

বাগানে গিয়ে হাজির হতেই সেখান থেকে দ্রুতপায়ে প্রস্থান করলেন

শ্রীশর্মা। ফিরে আসতে যাব, হঠাৎই দেখি কিষাণ আপ্তে দৌড়ে আসছেন আমার দিকে।

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। প্রশ্ন করলাম, 'কী হয়েছে, মিস্টার আপ্তে?'

হাঁফাতে-হাঁফাতে জবাব দিলেন তিনি, 'পেয়েছি! এতদিন পরে পাওয়া গেছে রিভলবারটা। চলুন, দেখবেন চলুন।'

আমি আর কোনও কথা না বলে দ্রুত তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম।

কিছুক্ষণ পর দুজনে এসে হাজির হলাম কবুতরের গেটের সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীনরসিংহ, সর্বেশ্বর রায়, ক্রসওয়ার্ড, আর সুচরিতা। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম মানেকজী ও প্রসাদজী হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। আর পেছনে ও কে! তরুণী কথাটা যাকে হুবহু মানায় সেইরকম একজন। নয়না কল্যাণী! নাঃ, রূপ আছে মেয়েটার! চোখে সানগ্লাস, ঠোঁটে লিপস্টিক। ঢল নামা চুলে মুখের অর্ধেকটাই প্রায় ঢাকা।

প্রথমে ভালো করে দেখলাম। সর্বেশ্বর রায়ের সুটকেশটা তাঁর পায়ের কাছে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, আর তার মধ্যে উঁকি মারছে একটা সুদৃশ্য কালো অটোমেটিক। সর্বেশ্বর রায় চেঁচাচ্ছিলেন, 'আমি তো বলেছি, আমি জানি না। আমার ব্যাগে কেউ যদি রিভলবার লুকিয়ে রাখে, তবে আমি কী করতে পারি?'

কিষাণ আপ্তে বললেন, 'ঠিক আছে মিস্টার রায়, আপনি যেখানে যাচ্ছেন যান। আমরা পরে এ-ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করব।'

বেশ রাগ-রাগ ভাব দেখিয়েই চলে গেলেন সর্বেশ্বর রায়।

ক্রসওয়ার্ড সুটকেশ থেকে রিভলবারটি বের করে নিয়েছিলেন। সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে বললেন, 'হুঁ, এটাই কাজে লাগানো হয়েছিল বলে মনে হয়। আপনার কী মনে হয়, মিস্টার আপ্তে?'

'পয়েন্ট থ্রি এইট বলেই মনে হচ্ছে।' ভালো করে সেটাকে পর্যবেক্ষণ করতে-করতে বললেন জেড।

'আচ্ছা, আপনারা এবার যাঁর-যাঁর ঘরে ফিরে যান—' ক্রসওয়ার্ড হাতে তালি দিয়ে বললেন, 'এখানে দয়া করে আর ভিড় করবেন না।'

মানেকজী, প্রসাদজী আর আমি ছাড়া সবাই চলে গেলেন। নয়না কল্যাণী চলে যাওয়ার আগে মানেকজীর সঙ্গে চাপা গলায় কীসব কথা বলে গেলেন।

মানেকজী অস্থিরতাকে আর চাপতে পারছিলেন না। বলে উঠলেন, 'ক্রসবি, কী সব ফ্যানটাস্টিক ব্যাপার হচ্ছে এখানে? সর্বেশ্বর রায় আমার পরিচিত। তুমি শিগগিরই এর একটা হেস্তনেস্ত করো। ফানি—!'

মানেকজী ও প্রসাদজী চলে গেলেন।

আমি এবার ক্রসওয়ার্ডকে বললাম, 'ইন্সপেক্টর, দেখুন, রিভলবারটায় কোনও

ফিঙ্গারপ্রিন্ট পান কি না।'

'আশা খুবই কম,' বললেন এজেন্ট জেড। তারপর চিন্তিত মনে তিনজনই ফিরে এলাম কবুতরে।

একটু পরে ছুটতে-ছুটতে আমার ঘরে এল সুচরিতা। বলল, 'কাঞ্চন, মনে পড়েছে। মনে পড়েছে—।'

'কী? কী মনে পড়েছে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলাম আমি।

'সেই রাতে কেউ আমাকে পাশ কাটিয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এ-ব্যাপারে আমি শিয়োর।' দৃঢ়স্বরে বলল সুচরিতা।

'কেন! কী হয়েছে?'

'আমি একটা গন্ধ পেয়েছিলাম,' বলল সুচরিতা, 'কিসের গন্ধ তা ঠিক বলতে পারব না, কিন্তু আজ আবার আমি গন্ধটা পেয়েছি। আজ, একটু আগে, সবাই যখন গেটের কাছে ভিড় করেছিল তখন!'

'তার মানে সে-রাতে কেউ একজন লাইব্রেরিতে লুকিয়ে ছিল। মিস্টার আপ্তে তা জানতে পারেননি। অথচ আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, ঘরে দু-চারজন লোক ছিল।'

আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই ঘরের দরজায় দেখা গেল সেই চাকরটিকে। কুণ্ঠিতস্বরে সে বলল, 'যদি এটা একবার দেখেন—' বলে আমার দিকে একটুকরো কাগজ বাড়িয়ে ধরল।

উঠে গিয়ে আমি সেটা হাতে নিলাম। তাতে একটা ঠিকানা লেখা।

আমি চোখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকালাম ওর দিকে। ও জবাব দিল, 'ওই দাড়িওয়ালাবাবুর পকেট থেকে পড়েছিল এটা।'

'দাড়িওয়ালাবাবু' মানে কিষাণ আপ্তে। কিন্তু এর অর্থ কী! জেড কি এই লোকটাকে পরীক্ষা করার জন্যে পকেট থেকে কাগজটা ইচ্ছে করেই ফেলেছেন? যাকগে, একবার শেষ চেষ্টা করব এই সূত্র ধরে। কিষাণ আপ্তের সঙ্গে কথা বলে এই ঠিকানায় একবার যাব। জানি কোনও লাভ হবে না, তবু—। এই আশা নিয়ে সুচরিতাকে বসতে বলে জেড-এর সঙ্গে দেখা করার জন্যে উঠলাম।

নীচের ঘরে এসে তাঁকে দেখলাম। বসে-বসে মানেকজীর সঙ্গে কথা বলছেন। আমি গিয়ে তাঁকে একপাশে ডাকলাম, বললাম, 'মিস্টার আপ্তে, আপনার পকেট থেকে কি এই কাগজটা পড়ে গিয়েছিল?'

'না তো—!' সবিস্ময়ে বললেন তিনি, 'কোথায় পেলেন এটা?'

আমি তাঁকে সব খুলে বললাম।

সব শুনে তিনি বললেন, 'ওই চাকরটা নিশ্চয়ই কারও হয়ে কাজ করছে।

দেখি, ব্যাটার মতলব কী!'

আমি আর দেরি না করে কবুতরের বাইরে এসে ক্রসওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করে বললাম, 'ইন্সপেক্টর, আমি একটা সামান্য সূত্র পেয়েছি। সেটা নিয়েই একবার শেষ চেষ্টা করতে চাই—' বলে তাঁকে সব বললাম, ঠিকানাটাও দেখালাম। শেষে যাওয়ার সময় বললাম, 'আপনি কাইন্ডলি লক্ষ রাখবেন যে, কেউই যেন কবুতর ছেড়ে কোথাও না যান।'

কবুতর ছেড়ে যাওয়ার সময় একবার পেছনদিকটায় উঁকি দিয়ে গেলাম। দেখলাম, কিরণ শর্মা তখনও গোলাপের বাগানে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছেন। আমাকে দেখেই সাঁৎ করে সরে গেলেন।

আমি মনে-মনে একটু হেসে কবুতর ছেড়ে রওনা দিলাম। হতাশা আমার মন ছেয়ে ফেলেছিল।

পোড়ো বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ঠিকানাটা মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। এই বাড়িটাই তো? ভাঙা নেমপ্লেট থেকে যেটুকু উদ্ধার করা গেল, তা খুবই সামান্য। তবু ঠিকানাটা মেলাতে অসুবিধে হল না। বনজঙ্গলে ভরতি এই ভাঙা পোড়ো বাড়িতে আর যেই থাক, মানুষ বাস করে বলে মনে হল না।

পা টিপে-টিপে ঢুকলাম বাড়ির চত্বরে। বেলা পড়ে এসেছিল। জায়গাটা ছায়া পড়ে অন্ধকার-অন্ধকার হয়ে রয়েছে। ধীরে-ধীরে বাড়ির পেছনদিকে গিয়ে পৌঁছলাম। ঝোপঝাড়ে ভরতি পেছনদিকটা। তারই মধ্যে কিছুক্ষণ লুকিয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে নীচের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি, সেখানে জনাসাতেক লোক বসে আছে। ঘরের দেওয়ালে একটা লাল পাঞ্জার ছাপ। এখানেও লাল পাঞ্জা!

লোকগুলোর আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, ওদের নেতা বা ওই ধরনের কেউ এখনও আসেননি। জানলা ছেড়ে সরে দাঁড়াতেই একজন লোককে হেঁটে যেতে দেখলাম। তার পেছনদিকটা দেখে খুব চেনা মনে হল। কিন্তু কে, তা কিছুতেই ধরতে পারলাম না। আমি তো ক্রসওয়ার্ডকে বারণ করে দিয়ে এসেছিলাম যে, কবুতর ছেড়ে কেউ যেন বেরোতে না পারে!

হঠাৎ মাথার ওপরের একটা জানলা থেকে ভেসে আসা গোঙানির শব্দ আমার কানে এল। সঙ্গে-সঙ্গে পুরনো জীর্ণ পাইপ বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। সবসময়ই ভয় হতে লাগল, পাইপটা যদি ভেঙে পড়ে, কিংবা কেউ যদি দেখে ফ্যালে!

শেষ পর্যন্ত জানলার কার্নিশে পৌঁছে জানলা ঠেলে ঘরে ঢুকলাম। অন্ধকার ঘরে আবছা-আবছা চোখে পড়ল একটি লোককে। ঘরের এক কোনায় হাত-

পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

কী করব ভাবছি—এমন সময় ঘরের আলো জ্বলে উঠল, আর আমার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে, তিনি কিরণ শর্মা।

আমি তাঁকে দেখে অবাক হয়ে বলে উঠলাম, 'তা হলে শেষ পর্যন্ত আপনিই নাটের গুরু—?'

কোনও জবাব না দিয়ে আমার দিকে দু'পা এগিয়ে এলেন তিনি। তারপরই পকেট থেকে একটা গাঢ় নীলচে রঙের রিভলবার বের করে উঁচিয়ে ধরলেন আমার দিকে, তাঁর মুখ ব্যঙ্গের হাসিতে বিকৃত হয়ে গেল...।

রাতে যখন কাঞ্চন ফিরল না, তখন খুবই মুষড়ে পড়ল সুচরিতা। কোত্থেকে কী হয়ে গেল। তাদের মধ্যেই একজন সমর বর্মন! কী সাঙ্ঘাতিক! তবে কাঞ্চন নিশ্চয়ই নয়। সত্যিই, কাঞ্চন ছেলেটা এমন দুরন্ত প্রকৃতির—দারুণ ছেলে। ওকে ছাড়া সুচরিতা নিজেকে ইদানীং ভাবতে পারে না। ও আসার পর থেকেই সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে আছে সুচরিতা।

ঠিক এমন সময় ঠক করে একটা আওয়াজ হল কাচের শার্সিতে। চকিতে জানলার দিকে ছুটে গেল সুচরিতা। জানলা খুলল—। নিচের সুরকি ঢালা পথে কেউ একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুচরিতা মুখ বাড়াতেই আর-একটা সাদা রঙের কী ছিটকে এল ঘরের ভেতরে। নিচু হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিল ও। কাগজে মোড়া একটা পাথর। কাগজটা খুলল...একী! এ যে কাঞ্চনের চিঠি। চিঠিতে লেখা :

সু,

ভীষণ বিপদ, শিগগির কবুতর ছেড়ে আমার লোকের সঙ্গে চলে এসো। অনেক কথা বলার আছে। আর, এদিকে কী হয়েছে জানো? কিরণ শর্মা হলেন...।

কাঞ্চন।

আর দেরি করল না সুচরিতা। চটপট তৈরি হয়ে নেমে এল নীচে। দেখল, লোকটি ওর পরিচিত। ওই লোকটিই কুমার রণজিতের চাকর ছিল।

সুচরিতা নেমে আসতেই সে চাপা গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি চলুন, বাবু আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন—।'

ওরা দুজন দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল।

সুচরিতা ভাবছিল—তা হলে কাঞ্চনের ধারণাই সত্যি হল। কিরণ শর্মাই আসল লোক!

কবুতরের বাইরে সুচরিতার গাড়ি ছাড়াও আর-একটা কালো রঙের স্ট্যান্ডার্ড

দাঁড়িয়েছিল। চাকরটার নির্দেশে সুচরিতা গিয়ে বসল সেই গাড়ির পিছনের সিটে। চাকরটা ওর পাশে এসে বসল।

ড্রাইভারের সিটে যে বসেছিল সে গাড়ি ছেড়ে দিল। লোকটির মুখ সুচরিতার চেনা মনে হচ্ছিল, কিন্তু পাশ থেকে দেখে ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না।

হঠাৎই পিছনদিকে মুখ ফেরাল লোকটি।

সঙ্গে-সঙ্গে খুশির বন্যায় ছলকে উঠল সুচরিতার আনন্দ : 'কাঞ্চন, তুমি!'

কাঞ্চন কোনও জবাব না দিয়ে হু-হু করে গাড়ি ছোটাতে লাগল।

'এ কী! কাঞ্চন, কী হয়েছে তোমার? কথা বলছ না কেন?' ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করল সুচরিতা।

কাঞ্চন এবারও কোনও জবাব দিল না। গাড়ি ছুটতে লাগল ঝড়ের গতিতে।

সামনের সিটের দিকে ঝুঁকে পড়ল সুচরিতা। খামচে ধরল কাঞ্চনের জামা। তারপর হিস্টিরিয়া রুগির মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'কাঞ্চন, কী ব্যাপার? কথা বলছ না—?'

'সুচরিতা, তুমি ভয় পেলে?' গম্ভীর স্বরে জবাব এল।

গাড়ি তখন ঝড়ের বেগে উল্কার মতো ধেয়ে চলেছে অজানার দিকে...।

শেষ দৃশ্য! বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, এতক্ষণ ঘটে যাওয়া 'কবুতর' নাটকের এটাই শেষ দৃশ্য।

কবুতরের লাইব্রেরি-ঘর। সেখানে আজ প্রায় সবাই হাজির হয়েছেন। মানেকজী, প্রসাদজী, সর্বেশ্বর রায়, নরসিংহ চৌধুরী, কিষাণ আপ্তে, ক্রসওয়ার্ড, তরুণ সান্যাল। ঘরে অনুপস্থিত কিরণ শর্মা, কাঞ্চন মৈত্র, সুচরিতা চৌধুরী এবং বরাবরের মতোই নয়না কল্যাণী—তিনি সম্ভবত মরফিনে আচ্ছন্ন।

'জেন্টল্‌মেন, আজ সব রহস্যই আমাদের কাছে পরিষ্কার। সমর বর্মনকে আমি খুঁজে পেয়েছি।' কিষাণ আপ্তে বলছিলেন, 'আপনারা শুনলে হয়তো অবাক হবেন যে, সেই দুর্ধর্ষ তস্কর সমর বর্মন আর কেউ নয়—শ্রীকাঞ্চন মৈত্র!'

ঘরে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। হতবাক দৃষ্টি মেলে সবাই তাকিয়ে রয়েছেন কিষাণ আপ্তের দিকে। তিনি তখনও বলে চলেছেন, 'মিস্টার ক্রসবির সঙ্গে আলোচনা করে আমি সবই জানতে পারি। ভেবে দেখুন কাঞ্চন মৈত্রের কথা। এই দিল্লিতে আসার আগে ইনি কী করতেন? কোথায় ছিলেন? ...কিছুই আমরা জানি না। চিঠিগুলো হারিয়ে যাওয়া এবং ফিরে পাওয়ার ব্যাপারটা দেখুন কী হাস্যকর। আসলে চিঠিগুলো উনি ডিকোড করতে পারছিলেন না। তাই যেমন করে হোক ওগুলোকে আবিষ্কার করলেন—তাও আবার নিজের

ড্রেসিং টেবিলেই—যাতে আমাদের দিয়ে ওগুলো ডিকোড করিয়ে নেওয়া যায়। কুমার রণজিতের মৃত্যুর ব্যাপারে তাঁর কথাগুলো ভেবে দেখুন। তিনি আসলে পৌনে একটায় হাজির হতে চেয়েছিলেন কবুতরে। হয়তো লাইব্রেরিটা খুঁজে দেখার ইচ্ছে ছিল। কোনও শব্দ-টব্দ পেয়ে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কুমার রণজিৎ। লাইব্রেরিতে গেলেন—সমর বর্মনকে চিনে ফেললেন। সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁকে গুলি করলেন শ্রীমৈত্র। তারপর আমাদের কাছে একটা বানানো গল্প ছেড়ে দিলেন। সুচরিতা চৌধুরীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাঁকেও দলে টানলেন। মনে রাখবেন, বেশিরভাগ ঘটনাই কাঞ্চনবাবুর নিজের স্টেটমেন্ট। লাল পাঞ্জা নামে আদৌ যে কোনও গ্যাং আছে তা আমি বিশ্বাস করি না। এরপর মিস্টার মৈত্র রিভলবারটা শ্রীরায়ের সুটকেশে পাচার করে দিলেন। সুড়ঙ্গ-পথে ঢুকে আমরা একটা খুপরি দেখতে পাই। তাতে কিছু না পাওয়ায় শ্রীমৈত্র অত্যন্ত ডিসহার্টেন্ড হয়েছিলেন।'

'কিন্তু সমর বর্মন সম্বন্ধে আমি যতদূর শুনেছি, সে কখনও মানুষ খুন করেনি,' দ্বিধাগ্রস্তভাবে জানালেন ক্রসওয়ার্ড।

'ঠিক কথা। কিন্তু তখনকার অবস্থাটা একবার চিন্তা করে দেখুন আপনারা। আমি গোপনে তাঁকে অনুসরণ করে অনেককিছুই জানতে পারি—।'

'কিন্তু তিনি এখন কোথায়?' সর্বেশ্বর রায় প্রশ্ন করলেন।

'যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের লোক তাঁকে খুঁজে বের করবেই।' দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন ক্রসওয়ার্ড।

ঠিক এই সময় সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন কিরণ শর্মা, কাঞ্চন মৈত্র ও সুচরিতা চৌধুরী। সঙ্গে সঙ্গে ক্রসওয়ার্ড এগিয়ে গেলেন কাঞ্চনের দিকে—।

হাতে হাতকড়া লাগানো অবস্থায় বিস্ময়-বিমূঢ় চোখে একবার তাকালাম সকলের দিকে। বিষণ্ণ হাসি হেসে সুচরিতার দিকে চেয়ে বললাম, 'সু, তুমিও কি এসব বিশ্বাস করো?'

'বিশ্বাস না করতে পারলেই খুশি হতাম...' সুচরিতার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

'আমি মিস্টার মৈত্রকে পরীক্ষা করার জন্যে তার অনুচরের—নেপালী চাকরটা, যে কুমারের সঙ্গে এখানে এসেছিল—সামনে ইচ্ছে করেই বাজে ঠিকানা লেখা একটা কাগজ ফেলে দিই। পরে দেখলাম, কাঞ্চনবাবু আমাকে ওটা দেখিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেন। কিন্তু এর মধ্যে আশ্চর্য কী জানেন!

ওই কাগজটা আমি পেয়েছিলাম কাঞ্চনবাবুর ঘর থেকেই—।' ব্যঙ্গের হাসি হেসে থামলেন কিষাণ আপ্তে।

দাঁতে দাঁত চেপে আগুন-ঝরা দৃষ্টি মেলে আমি এগিয়ে গেলাম ক্রসওয়ার্ডের দিকে। বললাম, 'মিস্টার ক্রসওয়ার্ড, প্লিজ, ফর হেভেন্স সেক—এই হাতকড়াটা কিছুক্ষণের জন্য খুলে দিন।'

কী ভেবে ক্রসওয়ার্ড আমার অনুরোধ রাখলেন। আমি ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলাম কিষাণ আপ্তের দিকে। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মিস্টার জেড, আমার নামে কেউ মিথ্যে কথা বললে আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। সুরেন্দ্র পালিত তাঁর স্মৃতিকথায় একটা কথা ঠিকই লিখেছিলেন—তা হল—' বলে আমি জেডের কানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'মানুষ নিজের কান কখনও চেঞ্জ করতে পারে না।' পরের মুহূর্তেই এক বিরাশি সিক্কার চড় মেরে তাঁকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বললাম, 'এটা আপনার মিথ্যে কথা বলার শাস্তি।' ক্রসওয়ার্ডের দিকে ফিরে বললাম, 'ব্যস্ত হবেন না, ইন্সপেক্টর—এই হল আপনাদের ভাষায় "দুর্ধর্ষ" সমর বর্মন!'

'অসম্ভব!' বলে উঠলেন ক্রসওয়ার্ড।

আমি উত্তরে মৃদু হেসে এগিয়ে গেলাম মেঝেতে পড়ে থাকা আপ্তের দিকে। একটানে তুলে ফেললাম তাঁর পরচুলা আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সানগ্লাসটা খুলে নিতেও ছাড়লাম না।

কিরণ শর্মা এক ফাঁকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এই সময় তিনি এসে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে এক ভদ্রলোক, তার চোখে সবুজ রঙের সানগ্লাস, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

'অবাক এ কী কাণ্ড সব!' বললেন নরসিংহ চৌধুরী।

'হ্যাঁ,' বললেন কিরণ শর্মা, 'ইনিই হলেন আসল কিষাণ আপ্তে বা এজেন্ট জেড। যাঁকে আমরা—মানে, আমি আর কাঞ্চনবাবু, একটা পোড়ো বাড়িতে বন্দী অবস্থায় পেয়েছি।'

'কিন্তু আপনি!' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন সর্বেশ্বর রায়।

'অধমের নাম, অরুণ চৌধুরী—ফ্রম ক্যালকাটা। পেশায় শার্লক হোমস—মানে, ডিটেকটিভ।'

'আপনিই!' বিস্ময়াপন্ন স্বর বেরিয়ে এল অনেকের গলা দিয়ে।

'হ্যাঁ, আমিই—। আমি কাঞ্চনবাবুকে সব খুলে বলেছি—উনিই আপনাদের সব বুঝিয়ে বলবেন। আমি কোনওদিন এরকম জটিল রহস্যের মুখোমুখি হইনি।'

ক্রসওয়ার্ড এগিয়ে গিয়ে ভূলুণ্ঠিত বর্মনকে দাঁড় করিয়ে হাতকড়া এঁটে দিলেন। বললেন, 'কিন্তু, মিস্টার চৌধুরী, কুমার রণজিৎকে খুন করল কে? সমর বর্মন?'

'না।' বললাম আমি, 'সে-কথায় পরে আসছি। প্রথম থেকেই বলা যাক সব। শ্রীনরসিংহ যেদিন হোটেলে গিয়ে আমার সঙ্গে পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে কথা বলেন, তখন আমি বুঝিনি অন্য উপায় বলতে তিনি কী বলতে চেয়েছিলেন। পরে আমি ফোন পাই মেহেতা অ্যান্ড সন্স থেকে। তারা একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠাচ্ছে পাণ্ডুলিপিটার জন্যে। সন্দেহ হওয়ায়, সঙ্গে-সঙ্গে আমি ফোন করি মেহেতা অ্যাণ্ড সন্সে। কিন্তু তারা আমাকে জানায় যে, তারা কোনও ফোনই করেনি। আমি তখন আসল পাণ্ডুলিপিটা হোটেল কন্টিনেন্টালের ভল্টে রেখে নকল একটা প্যাকেট গজানন শিকদারের হাতে তুলে দিই।'

'এখনও তা হলে পাণ্ডুলিপিটা আপনার কাছেই আছে?' প্রশ্ন করলেন মানেকজী।

'হ্যাঁ—হোটেলের ভল্টে। সে যাক, এর পরের ব্যাপার আরও ঘোরালো। চিঠিগুলো আমার কাছে থেকে চুরি করেছিল ইব্রাহিম। সে লাল পাঞ্জার হয়ে কাজ করছিল। পরে বোধহয় বেলাইনে চলার জন্যে সে মার্ডার হয়। তখন মার্ডারার—কুমারের হত্যাকারী—তাদের নির্দেশ দেয় সুচরিতাকে ফাঁসানোর জন্যে। কারণ? কারণ নিশ্চয়ই একটা ছিল।

'আমি পুলিশী ঝামেলা এড়ানোর জন্যে ইব্রাহিমের বডি নিয়ে কী করেছি তা আপনারা জানেন। এদিকে ইব্রাহিমের কাছ থেকে চিঠিগুলো চলে যায় হত্যাকারীর হাতে। কিন্তু এর আগে একটা চিরকুটে সে ইব্রাহিমকে তার সঙ্গে কবুতরে দেখা করতে বলেছিল। সম্ভবত সে নেকলেসটা পাচার করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইব্রাহিম মারা যাওয়ায় এবং চিরকুটের ব্যাপারটা ভুলে যাওয়ায় ওটা আমার হাতে পড়ে। আমি সেই রাতে কবুতরে আসি এবং কী ঘটেছিল তা আবার বলার বোধহয় দরকার নেই। হত্যাকারী যখন নেকলেসটা লাইব্রেরিতে খুঁজছিল তখন কুমার আচমকাই সেখানে এসে হাজির হন এবং তাকে চিনতে পারেন। সঙ্গে-সঙ্গে হত্যাকারী তাঁকে গুলি করে। এই নেকলেস নিয়ে এর আগেও একজন অজ্ঞাতপরিচয় লোক খুন হয়েছিল—এই কবুতরেই।

'সমর বর্মনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল হত্যাকারী। এবং প্রথম রাতে যখন বর্মন (আপ্তের পরিচয়ে) লাইব্রেরিতে ঢোকে তখন তার সঙ্গে মার্ডারার ছিল। সে সুচরিতার পাশ কাটিয়ে অন্ধকারেই বেরিয়ে যায়। সুচরিতাকে অরুণ চৌধুরী ইচ্ছে করেই আটকেছিলেন। কারণ, তখনও তিনি জানতেন যে, আসল এজেন্ট জেডই গোপনে তদন্ত করছেন। পরে তিনি বর্মনের ছদ্মবেশটা ধরে ফেলেন শুধু তার কানের জন্যে। আপনারা আসল জেডকে দেখুন—তাঁর কানের লতিটা গালের সঙ্গে লাগানো নয়। অথচ সমর বর্মনের কান লক্ষ করুন—কানের লতিটা গালের সঙ্গে লাগানো। সুরেন্দ্র পালিত এই কথাই লিখেছিলেন তাঁর পাণ্ডুলিপিতে।'

'কিন্তু, কুমারের হত্যাকারী কে?' প্রশ্ন করলেন প্রসাদজী।

'রাণী সুলক্ষণা সেন। কুমার রণজিৎ সেনের বোন—অথবা শ্রীমতী নয়না কল্যাণী।'

অবাক হয়ে সবাই তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

মানেকজী কোনওরকমে বললেন, 'ইমপসিব্‌ল!'

আমি ওঁর দিকে ফিরে হেসে বললাম, 'উনি আপনার দূরসম্পর্কের বোন। কিন্তু এখানে আসার আগে কি আপনি ওঁকে কখনও চোখে দেখেছেন?'

মানেকজী হতভম্ব হয়ে মাথা নাড়লেন, বললেন, 'না—।'

ঠিক তখনই লাফিয়ে উঠল সুচরিতা, 'মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, কাঞ্চন, —সেই রাতে আমি ল্যাভেন্ডারের গন্ধ পেয়েছিলাম—আর নয়না কল্যাণীর গা থেকে কাল ওইরকম গন্ধ পেয়েছি—তখন আমার ঠিক মনে পড়েনি।'

'প্রসাদজী, মনে করে দেখুন—যখন গুপ্তপথে আমরা ঢুকেছিলাম, তখন বর্মনের অতিআগ্রহের কথা—। নয়না কল্যাণী নিজেই চেষ্টা করেছিলেন চিঠিগুলো ডিকোড করতে। কিন্তু না পেরে কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে-কথা আপনারা নকল জেডের কাছ থেকে শুনেছেন। কুমারের মৃত্যুর রাতে নয়না কল্যাণীর ঘরেই আলো জ্বলেছিল।'

'কিন্তু আসল নয়না কল্যাণী গেলেন কোথায়?' প্রশ্ন করলেন শ্রীসর্বেশ্বর রায়।

'তিনি কবুতরে আসার পথে বদল হয়েছেন। আসল নয়নার বদলে এসেছেন সুলক্ষণা সেন। সুলক্ষণা সেনকে আমি দেখিনি। আমি তখন নেপালে ছিলাম, কিন্তু সুচরিতা তাঁকে দেখেছিল। তাই, ও যদি চিনে ফ্যালে...তাই ওকে কবুতরে আসা থেকে আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল।'

'সুলক্ষণা সেন কি বিপ্লবের সময় মারা যাননি?' মানেকজী প্রশ্ন করলেন।

'না, কারণ তাঁর মৃতদেহ শনাক্ত করা যায়নি। আমি এটা সন্দেহ করেছিলাম। সুলক্ষণা সেন অভিনেত্রী ছিলেন। তিনি তাঁর দাসীর ছদ্মবেশে পালিয়ে বাঁচলেন, আর তার দাসী মারা পড়ে বিপ্লবীদের আগুনে।

'এবার একটা কথা বলি—তা হল ঠিকানা লেখা চিরকুটটার কথা। ওটা সমরের পকেট থেকেই পড়েছিল—ওর অজান্তে। আমি ইন্সপেক্টরকে বলেছিলাম কেউ যেন কবুতর ছেড়ে না যায়। তাই বর্মন বেরোতে পারেনি। কিন্তু অরুণ চৌধুরীর পরিচয় ক্রসওয়ার্ড জানতেন। তাঁই তাঁকে যেতে দিয়েছিলেন। মিস্টার চৌধুরীও প্রথমে আমাকেই সন্দেহ করেছিলেন।

'সুলক্ষণাকে যদি সুচরিতা চিনে ফেলত তবে ওর বিপদ হত, তাই আমি চিঠি দিয়ে ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি একটু অভিনয় করাতে ও দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল।' আমি সু'র দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

'আপনার আসল পরিচয়টা সবাইকে এবার বলুন, ইয়োর মেজেস্টি।' অরুণ চৌধুরী বললেন।

'তার মানে!' আটটি কণ্ঠস্বর একসঙ্গে বলে উঠল।

'আমিই শুদ্ধসত্ত্ব রায়ের ছেলে—অতলান্ত রায়। আমিই রটিয়ে দিয়েছিলাম যে, অতলান্ত রায় নেপালে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।'

'কিন্তু, কুমার, নেকলেসটা কোথায় গেল?' মানেকজী প্রশ্ন করলেন।

'গোলাপ বাগানের নীচে। সারি-সারি গোলাপের ইঙ্গিতই ছিল ওই সাঙ্কেতিক চিঠিতে।' বললেন অরুণ চৌধুরী।

'তোমার পরিচয় আমাকে আগে বলোনি কেন?' অনুযোগের সুরে বলল সুচরিতা।

'তা হলে আমি অ্যারেস্টেড হতাম। কারণ রণজিতের পর আমিই ছিলাম সিরাজনগরের অধিপতি।' হেসে জবাব দিলাম আমি।

'রিভলবারটা আমার সুটকেশে তা হলে নয়নাই রেখে দিয়েছিল?' সর্বেশ্বর রায় জানতে চাইলেন।

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম আমি।

'চলুন, এবার মিসেস সেনের খোঁজ নেওয়া যাক।' ক্রসওয়ার্ড বললেন।

তাই তো! কারওরই খেয়াল ছিল না কথাটা। সবাই মিলে দৌড়ে গেলাম ওপরে।

গিয়ে দেখলাম নিজের ঘরে নিষ্প্রাণ দেহে পড়ে আছেন নয়না কল্যাণী।

'আত্মহত্যা করেছেন।' বললেন কিষাণ আপ্তে।

'সম্ভবত মরফিনের সাহায্যে।' জানালাম আমি।

এরপর হীরের নেকলেসটা খুঁজে পাওয়া গেল গোলাপ বাগান খুঁড়ে। আবার শান্ত হল কবুতর। সুচরিতার সঙ্গে আমার বিয়েটা হয়ে যাওয়ার পরদিন কাগজে দেখি একটা বিজ্ঞাপন।

'কবুতর বিক্রি হচ্ছে। উৎসুক ক্রেতারা খোঁজ নিন।'

—মানেকজী প্রসাদজী লিমিটেড কোং

যার হাতেই তুমি যাও, তোমার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে কবুতর। সুচরিতার বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

দুই

॥ এক ॥

রোহিত রায় আচমকা অনুভব করল কেউ তাকে অনুসরণ করছে। প্রথমে সে এতটা নিশ্চিত হতে পারেনি। কারণ রফি আহ্‌মেদ কিদওয়াই স্ট্রিট থেকে পার্ক স্ট্রিটে মোড় নেওয়ার পর পায়ের শব্দটা আর কানে আসেনি। সামনের দিকে অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে চললেও শিকারী কুকুরের মতো সে সর্বক্ষণ কান খাড়া করে রেখেছে। বিভিন্ন মানুষের পদক্ষেপের বিচ্ছিন্ন শব্দে সেই বিশেষ শব্দটা যেন হারিয়েই গিয়েছিল। কিন্তু ভাঙা বাড়িটা ছাড়িয়ে পেট্রল পাম্পের কাছে পৌঁছতেই শব্দটা আবার শুনতে পেয়েছে রোহিত। হায়েনার মতো হালকা অথচ তৎপর পায়ের শব্দ। সুতরাং বিশাল ঝুঁকি নিয়ে পিছনে ফিরে তাকাল সে। শীতের কুয়াশা ঢাকা সন্ধ্যা এবং দূরের নিওন সাইনের আলোয় স্পষ্টভাবে কারও মুখ নজরে পড়ল না।

অফিস ছুটির সময়। তাই পথচারীর সংখ্যাও কিছু বেশি। তার মধ্যে সেই বিশেষ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা রোহিতের পক্ষে সম্ভব হল না। কিন্তু শব্দটা পিছনে যেন আঠার মতো লেগে রইল। বিচিত্র এক অনুসরণের ছন্দ : ডট-ড্যাশ, ডট-ড্যাশ...। যেন চাবি টিপে মর্স কোডে ইংরেজি বর্ণমালার 'এ' অক্ষরটাকে কেউ অবিরামভাবে বাজিয়ে চলেছে।

পার্ক হোটেলের নীচে পৌঁছে ফুটপাতে বসা বইয়ের দোকানের কাছে থমকে দাঁড়াল রোহিত। বিচলিত কালো চোখজোড়া মেলে ধরল সামনের কাচের শো-কেসের দিকে। সেই 'আয়নায়' লক্ষ করে চলল পথচারীদের ঝাপসা মুখগুলো। কিন্তু সন্দেহজনক কাউকেই নজরে পড়ল না। অবশেষে বই দেখার ভান করে সে যখন আবার চলতে শুরু করল তখন হঠাৎই তার খেয়াল হল, অনুসরণের অদ্ভুত শব্দটা থেমে গেছে। তা হলে কি তাকে থামতে দেখে অনুসরণকারীও থমকে দাঁড়িয়েছে?

রোহিত রায়ের চলার গতি সামান্য দ্রুত হল। একটা শূন্য অনুভূতিতে তার পাকস্থলীটা যেন মোচড় দিয়ে উঠছে। সে বুঝল, সে ভয় পেয়েছে। যেমন পেয়েছিল কাশ্মীর সীমান্তে দাঁড়িয়ে সাইরেনের আচমকা বুক কাঁপানো শব্দে। অজস্র গাড়ির হর্নের শব্দ তার কানে দামামা বাজাতে লাগল। এতগুলো তীক্ষ্ণ শব্দের মিলিত স্বননে পা টেনে চলার অদ্ভুত শব্দটা ক্ষণিকের জন্য চাপা পড়ে গেল।

চৌরঙ্গী রোডে পড়ে ডান দিকে বাঁক নিল রোহিত। মনে হল, হঠাৎই যেন আলোর রাজত্ব ছেড়ে আবছা অন্ধকার সীমানায় এসে সে পা দিয়েছে। ওপারে গান্ধীজীর মূর্তি কুয়াশাচ্ছন্ন ফ্যাকাসে আলোর বৃত্তে ডাণ্ডি অভিযানের মুহূর্তে কিছুটা যেন দ্বিধাগ্রস্ত। এ-দিকটায় দোকানপাটের সংখ্যা কম থাকায় রাস্তার আলোগুলোই অন্ধকারের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। ফুটপাত ধরে চলতে-চলতে রোহিত এবার স্পষ্ট শুনতে পেল পায়ের শব্দটা—এবং পিছন ফিরে তাকাল।

এখানে পথচারী কম। কিন্তু তার মধ্যেও রোহিতের এমন কাউকে চোখে পড়ল না, যার চলায় কোনও অসঙ্গতি নজরে পড়ছে। অথচ এই পা টেনে চলার ডট-ড্যাশ ছন্দ তাকে যেন ক্রমশ পাগল করে তুলছে।

রোহিতের হাতের চেটো ঘামে ভিজে উঠল। ওর সন্দিহান চোখজোড়া প্রথমে জরিপ করল গোলাপী গাউন পরা জনৈকা বৃদ্ধা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলাকে। তাঁর হাতে একটা সাদা ঠোঙা, ধবধবে সাদা চুল, এবং সঙ্গে একটা পিকিনিজ কুকুর। তার একটু পিছনেই একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা। হাতে ব্রিফকেস। সম্ভবত অফিস থেকে ফিরছেন। আর যে-দুজনকে রোহিতের চোখে পড়ল, তারা অল্পবয়েসী তরুণ-তরুণী। সাজে আধুনিক, এবং একান্ত-সংলাপে মগ্ন।

এ ছাড়া কাছাকাছি আর কোনও পঞ্চম ব্যক্তি নেই।

রোহিত এবার কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়ল। চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিল। পশ্চিম দিকের খোলা মাঠের হাওয়াকে রুখতে জ্যাকেটের কলার তুলে কান ঢাকতে চাইল। দূরে সারি-সারি আলোর ইশারা চোখে পড়ছে : এসপ্ল্যানেড অঞ্চলের সন্ধের জাঁকজমক। ভয়ার্ত রোহিত যেন কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেল পিছনের অনুসরণকারীর কথা, প্যান্টের ডান পকেটে রাখা অমূল্য চুনিটার কথা...।

সংবিত ফিরতেই রোহিত টের পেল তার ডান হাত প্যান্টের পকেটে রাখা চুনিটাকে ঘামে-ভেজা মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছে। ও জানে, ওর সব আশঙ্কা, আতঙ্কের একমাত্র চাবিকাঠি এই চুনিটা। কী করে এটা রোহিতের হাতে এল

সে-ইতিহাস দীর্ঘ। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রপেলারের ব্লেডে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া সুখেন বর্মার দলা-পাকানো শরীরটা। সে-স্মৃতি বড় নৃশংস, বীভৎস। এই যে গত চারদিন ধরে পুলিশ তার পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরছে, সে শুনতে পাচ্ছে এই অদ্ভুত অনুসরণের ছন্দ—এ সবের কারণ একটাই—এই রক্ত-চুনি—'বহ্নিশিখা'।

সুতরাং এত সব চিন্তার পর একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই পৌঁছনো সম্ভব—হয় পুলিশ, না হয় 'ওরা' এই মুহূর্তে রোহিতকে অনুসরণ করছে। তা হলে কি পুলিশ তার গতিবিধির সন্ধান পেয়েছে? নাকি 'ওরা' শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজে বের করেছে?

'ওরা' কারা রোহিত জানে না। শুধু জানে ওরা বহ্নিশিখাকে পেতে চায়—তা সে যেভাবেই হোক। দরকার হলে রোহিতকে ওরা স্বর্গের সিঁড়ি দেখাতেও ছাড়বে না।

গত চারদিন ধরে শত অনুসন্ধানী নজর চালিয়েও সন্দেহজনক কাউকে রোহিত খুঁজে পায়নি। শুধু অনুভব করেছে শীতার্ত হাওয়ার শীতল প্রলেপ। এবং ভয় পেয়েছে।

লিন্ডসে স্ট্রিটের মুখে পৌঁছে আর-একবার পিছন ফিরে তাকাল রোহিত। সেই বৃদ্ধা এবং প্রৌঢ় ভদ্রলোকই এখনও তার পিছন-পিছনই আসছেন। হয়তো তাঁরা রোহিতকে চেনেনও না। হয়তো তাঁরা নির্দোষ। কিন্তু রোহিত এখন কোনওরকম ঝুঁকি নিতে পারে না। মর্স কোডের শব্দ তাকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছে শত্রুপক্ষের নিঃশ্বাস। তাদের কেমন দেখতে, কী তাদের পরিচয় এসব রোহিতের অজানা হলেও এই পায়ের শব্দ যে তার খুব চেনা।

সুতরাং রোহিত এখন আশ্রয় চাইল। জনারণ্যের আশ্রয়। তাই সে মোড় নিল ডান দিকে। এগিয়ে চলল লিন্ডসে স্ট্রিট ধরে। কিন্তু হ্যান্ডলুম হাউসের কাছে পৌঁছেই সে বুঝল শত্রুপক্ষকে সে ধোঁকা দিতে পারেনি। কারণ সে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে সেই পায়ের শব্দও মোড় নিয়েছে তার পিছু-পিছু।

চোরাচাউনিতে পিছনে তাকাল রোহিত। আগের দুজনের সঙ্গে তৃতীয় একজন যুবক এখন যোগ দিয়েছে।

এবার আতঙ্কে উদভ্রান্তের মতো হয়ে পড়ল রোহিত রায়। আজ কি তার আর নিস্তার নেই? অন্যান্য দিন আগে হোক পরে হোক ওই পায়ের শব্দকে নানান কায়দায় ঠকাতে পেরেছে। কিন্তু আজ সেই কালান্তক ডট-ড্যাশ শব্দ যেন অমোঘ নিয়তির মতো রোহিতের পিছনে প্রতিটি মুহূর্তে হাজির। কিন্তু যেভাবেই হোক এই পাথরটাকে বাঁচাতেই হবে। পুলিশ যদি তাকে অনুসরণ করে থাকে তা হলে পাথরবিহীন রোহিতকে গ্রেপ্তার করে কোনওরকম কেসই

ওরা দাঁড় করাতে পারবে না। আর অনুসরণকারী যদি পুলিশ না হয় এবং রোহিতের বিশ্বাস, পুলিশ নয়—তা হলে বিপদের ধরন আরও ভয়ঙ্কর। 'ওরা' পাথরটাও চায়, সঙ্গে চায় রোহিত রায়কে। কিন্তু মরে গেলেও বহ্নিশিখা ওদের হাতে রোহিত তুলে দেবে না। কিছুতেই না। বহ্নিশিখা শুধু তার। তার একার।

হাতঘড়িতে চোখ রাখল রোহিত। ছ'টা বাজতে কুড়ি। এই মুহূর্তে কোথায় লুকনো যায় চুনিটাকে? চকিতে চারপাশে তাকিয়ে উত্তর খুঁজে পেল রোহিত।

নিউ মার্কেট।

মার্কেটের কোনও স্টেশনারি কিংবা ইমিটেশান গয়নার দোকানে এই চুনির লকেট বসানো হারটা লুকিয়ে ফেলবে সে। তারপর নিজেকে লুকিয়ে ফেলবে নিউ মার্কেটের জনতার ভিড়ে। পরে, নিশ্চিন্তে, অবসর সময়মতো ফিরে এসে সেই দোকান থেকে দাম দিয়েই কিনে নেবে পাথরটা। পঁচিশ টাকা দিয়ে ফিরিয়ে নেবে পঁচিশ হাজার টাকার জিনিস।

সুতরাং নিউ মার্কেট লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি পা চালাল রোহিত। এই চেষ্টাই তার শেষ চেষ্টা।

মার্কেটের দরজার সামনে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল সে। কান পেতে শুনতে চাইল মর্স কোডের ছন্দ। কিন্তু না, কোনওরকম বিশেষ শব্দই তার কানে এল না। সম্ভবত চলমান পথচারী ও যানবাহনের কলগুঞ্জনে সেই শব্দ হারিয়ে গেছে।

আর অপেক্ষা না করে আলোর পরিবেশে পা রাখল রোহিত। সতর্ক অথচ দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল।

অনুসরণের শব্দ শুনে বিচলিত হয়েছিল রোহিত রায়। এখন সেই শব্দ শুনতে না পেয়ে ত্রাসে উন্মাদ হয়ে উঠল। কে জানে অনুসরণকারী তার ঠিক কতটা পিছনে রয়েছে! দিগ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল রোহিত।

ক্রিসমাস আর বেশি দূরে নেই। তা ছাড়া গত কয়েকদিন হঠাৎ করে বৃষ্টি হওয়ায় অনেকেই প্রয়োজনীয় কেনাকাটায় বেরোতে পারেনি। এই দুটো কারণেই আজ এমন অমানুষিক ভিড়। এত লোক, এত পায়ের শব্দ—কিন্তু এর মধ্যে সেই চেনা পায়ের শব্দ কই?

হঠাৎই রোহিতের মনে হল, অনুসরণকারীকে সে হয়তো ঠকাতে পেরেছে। কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে ভিড়ের মাঝে ভাসতে-ভাসতে সে এগিয়ে চলল একটা ইমিটেশান গয়নার দোকানের দিকে।

নাথানি রোল্ড-গোল্ড এম্পোরিয়াম।

ভেতরে ঢুকল রোহিত।

চূড়ান্ত ভিড়ের মাঝে সুবেশা যুবতীদের সংখ্যাই বেশি। অন্যসময় হলে রোহিতের মনোযোগের অনেকটাই খরচ হত দোকানের সুন্দরীদের জন্য, কিন্তু এই সংকটকালে হৃদয়ের তুলনায় মাথা বেশি কাজ করছিল।

সুতরাং দোকানের একেবারে ভেতরে ঢুকে গেল সে। আড়চোখের সতর্ক নজর দোকানের সদরের দিকে। কানের মনোযোগও একই দিকে—যদি চোখ ও কানের যুগলবন্দিতে অনুসরণকারীকে চিনতে পারে রোহিত।

হঠাৎ সেই পথে-দেখা যুবক ভিড় ঠেলে ঢুকল দোকানে। দু-চোখে তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি।

তাকে চিনতে পারল রোহিত এবং বুঝল সে রোহিতের অনুসরণকারী নয়, তার পায়ে নেই মর্স কোডের ছন্দ। কিন্তু সাবধানের মার নেই। তাই সকলের অমনোযোগের সুযোগে পকেট থেকে চুনি বসানো বিছেহারটা বের করে এনেছে রোহিত।

একটা সরু চেনের ঠিক মাঝখানে মাঝারি নুড়ির মাপের একটা রক্ত-লাল চুনি।

পাথরটা একপলক দেখে হাতের মুঠোয় লুকিয়ে ফেলল রোহিত। তারপর তাকাল সামনের সেল্‌সম্যানের দিকে। তার ঠিক পিছনে এবং পাশে হুকের গায়ে ঝুলছে রাশি-রাশি ঝুটো পাথরের মালা।

মনে-মনে হাসল রোহিত। সরাসরি তাকাল সেল্‌সম্যানের চোখে।

'ইয়েস?' সৌম্য হেসে রোহিতকে আপ্যায়ন করল সেল্‌সম্যান।

'একটা পাথরের লকেট বসানো মালা কিনতে চাই—দেখাবেন?'

'উইথ প্লেশার।'

হুক থেকে একের পর এক মালা নেমে আসতে লাগল ল্যামিনেটেড প্লাস্টিক লাগানো কাউন্টারে। ক্ষিপ্র হাতে মালা বাছতে শুরু করল রোহিত। এবং তারই ফাঁকে নিজের হাতের মালাটাকে অন্যান্য মালার ভিড়ে লুকিয়ে ফেলল।

কেনাকাটায় দোকানের ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলেই ব্যস্ত। সুতরাং এই সামান্য ব্যাপারটা কারও নজরে পড়ল না।

একটু পরেই অস্পষ্ট গলায় 'মনের মতো হচ্ছে না—থ্যাংক য়ু।' বলে কাউন্টার থেকে সরে এল রোহিত। বেরোনোর মুখে ফিরে তাকিয়ে দেখল, সেল্‌সম্যানটি মালাগুলো আবার হুকে সাজিয়ে রাখছে।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল রোহিতের বুক ঠেলে। বহ্নিশিখা এখন নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। নাথানি এম্পোরিয়াম যদি ক্রিসমাস সেলের জন্য আটটার জায়গায় রাত দশটাতেও বন্ধ হয়, তা হলেও এই কয়েক ঘণ্টা সময়ে কেউ

যে এসে বহ্নিশিখাকে ঝুটো পাথরের দাম দিয়ে কিনে নেবে, সে-সম্ভাবনা কম। সামান্য এই ঝুঁকিটুকু রোহিতকে নিতেই হবে। কাল সকাল দশটায় দোকান খোলার সময়ে সে আসবে, ফিরিয়ে নেবে তার বহ্নিশিখাকে।

হাতের আড়ালে মুখ ঢেকে দোকানের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বাইরে এল রোহিত। ভিড়ের মধ্যে সেই যুবক তখনও চঞ্চল চোখে বোধহয় তাকেই খুঁজছে।

নিউ মার্কেটের বাইরে এসে দাঁড়াল রোহিত। এই মুহূর্তে পায়ের শব্দ শোনার জন্য সে মনোযোগ দিল না। কারণ অসংখ্য গাড়ির তীব্র হর্নের শব্দ সেই পায়ের শব্দকে ঢাকা দিয়েছে। একপলক থমকে দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে রাস্তা পার হতে লাগল রোহিত। সতর্ক চোখ দু-পাশের গাড়ির দিকে।

রাস্তা পার হয়ে সে এগিয়ে চলল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে।

এ-দিকটার তুলনায় সেখানে আলোর রোশনাই অনেক কম চোখে পড়ছে। অন্ধকার ও তার অনুসঙ্গী কুয়াশা ধীরে-ধীরে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। শীতের ঠাণ্ডা আমেজটাও যেন তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমশ গাঢ় হয়ে উঠছে। দূরের আলোর সারির দিকে একপলক দেখল রোহিত, পায়ের গতি দ্রুত করল।

সেই মুহূর্তে খুব চেনা মর্স কোডের ছন্দটা আবার তার কানে এসে বাজল।

বহ্নিশিখাকে নিরাপদ আশ্রয়ে লুকোতে পেরে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল রোহিত। এমনও ভেবেছিল, অনুসরণকারীকে সে ধোঁকা দিতে পেরেছে। কিন্তু পারেনি। 'ওরা' এখনও রোহিতের পিছু ছাড়েনি। কিন্তু 'ওরা' হয়তো জানে না বহ্নিশিখা এখন তার কাছে নেই। মনে-মনে আরও একবার হাসল রোহিত।

এসে থামল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মুখে। কিছুক্ষণ আগের উজ্জ্বল পরিবেশের তুলনায় এ-জায়গাটা বড় বেশি অন্ধকার হলেও গাড়ি চলাচলের কমতি নেই। সার বেঁধে ঝকমকে গাড়িগুলো পিচের কালো রাস্তায় পিছলে যাচ্ছে।

গাড়ি চলাচল একটু ফিকে হলেই সে রাস্তা পার হবে, ভাবল রোহিত। কয়েকটা মুহূর্ত সুখ-স্বপ্নে মগ্ন হয়ে রইল সে। কিন্তু স্বপ্নের ঘোর কেটে যাওয়ার আগেই জীবনে শেষবারের মতো চমকে উঠল রোহিত রায়।

আঘাতটা এল তার পিছন থেকেই। ঠিক ঘাড় ও পিঠের ওপর—একইসঙ্গে। প্রচণ্ড আঘাতে সামনের রাস্তার দিকে ছিটকে পড়ল রোহিত। তার চোখের সামনে গোটা সড়কটা বনবন করে ঘুরে উঠল—ঠিক প্রপেলারের ব্লেডের মতো। ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার আগেই তার চোখের সামনে চলে এল একটা বিশাল কালো শেভ্রলে গাড়ি। দুরন্ত গতি নিয়ে গাড়িটা ছুটে এল টলায়মান রোহিতের শরীর লক্ষ করে। আতঙ্কবিকৃত রোহিতের মুখে পলকের

জন্য ফুটে উঠল বিস্ময়। এই ঘটনা—অথবা দুর্ঘটনা—যে তার জীবনে সত্যি-সত্যিই ঘটতে চলেছে, সম্ভবত সেই কথা ভেবেই।

জীবনে আর্ত চিৎকার শব্দের ঠিকঠাক মানে রোহিত কোনওদিনই বুঝতে পারেনি। কিন্তু এই অন্তিম মুহূর্তে তার বুক চিরে বেরিয়ে এল এক বিকট বীভৎস আর্ত চিৎকার। সে-চিৎকার প্রতিধ্বনিত হল রাস্তার দু-পাশে দাঁড়ানো বাড়িগুলোর জীর্ণ দেওয়ালে। সে-চিৎকারের তীক্ষ্ণতায় বুঝি কেঁপে উঠল রাতের শীতার্ত কুয়াশা।

আশ্চর্যের কথা, রোহিতের অন্তিম চিন্তায় বহ্নিশিখার ছায়া পড়ল না। রোহিতের মনে পড়ল তার তিন বছরের ছোট ছেলে সুমনের কথা। রোহিত স্পষ্ট দেখল, শেষবারের মতো, সুমন ললিপপ খাচ্ছে।

॥ দুই ॥

আধুনিক প্রসাধনের কিছু জিনিসপত্র আর টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কেনাকাটা করতে নিউ মার্কেটে এসেছিল সারিকা।

এখানে এলে কেনাকাটার চেয়ে ঘুরে-ফিরে দেখাটাই হয়ে যায় বেশি। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। হেয়ার স্প্রে, ফাউন্ডেশান, কোল্ড ক্রিম, ম্যাক্স ফ্যাক্টর, ম্যাসকারা, আর ছোটখাটো কয়েকটা জিনিসে সারিকার পলিথিন ব্যাগ তখন ভরতি, ওর নজরে পড়ল নাথানি রোল্ড-গোল্ড এম্পোরিয়ামের ক্রিসমাস-আলোকসজ্জা। প্রয়োজনের শেষে উদ্দেশ্যহীন পথ চলা মানেই বাড়তি খরচ—অন্তত নিউ মার্কেটে। এখনও তাই হল। পলিথিন ব্যাগকে সযত্নে আঁকড়ে ধরে দোকানে ঢুকেই পড়ল সারিকা।

আজ চেনা কাউকে ওর নজরে পড়েনি। পড়লে হয়তো গল্পে মশগুল হয়ে উদ্দেশ্যহীন অলস ভ্রমণের হাত থেকে রেহাই পেত। এই তো, গত সপ্তাহেই নিশীথের সঙ্গে আচমকা দেখা হয়ে গিয়েছিল।

নিশীথ সান্যাল! নামটা অনুভবের সঙ্গে-সঙ্গে সেতারের মূর্ছনার কোনও সম্পর্ক আছে কি? ছ' মাস আগেও তো এমন ছিল না। আপনমনেই হাসল সারিকা। কীভাবে দিন কেটে যায়, আশ্চর্য!

নাথানি এম্পোরিয়ামে অসম্ভব ভিড়। কানে আসছে কলগুঞ্জনের শব্দ। অপছন্দের এই দুটো কারণ থাকা সত্ত্বেও সারিকার আকর্ষণ কমেনি। রূপসী দোকান ওর ভালো লাগে।

ভিড়ের স্রোতে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে অনেকটা ভেতরে পৌঁছে গেল সারিকা। তখনই ওর চোখ পড়ল দেওয়ালের গায়ে হুকে ঝোলানো লকেটগুলোর

ওপর।

কাউন্টারে দাঁড়ানো সেল্‌সম্যানের মনোযোগ সারিকার ওপর পড়ল। প্রশ্ন করল সে, 'ইয়েস, মিস?'

'না, এমনি দেখছি—।' একটু বিব্রত হল সারিকা।

উত্তরে হাসল সে : 'উইথ প্লেশার।'

সারিকা ছোট্ট হাসিতে জবাব দিল।

ওর চোখ খেলে বেড়াতে লাগল লকেট থেকে লকেটে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই চরম সর্বনাশটা ঘটে গেল। ওর নজরে পড়ল আগুন-রং চুনিটা।

পাথরটা হারের সারিতে বেমানান এবং অত্যন্ত খাপছাড়া। দেখে আকাটা বলেই মনে হয়। সঙ্গের সোনালী চেনটা দু-পাশ থেকে এসে দুটো সাপের মাথার মাঝখানে আঁকড়ে ধরেছে পাথরটা। আকাটা হলেও তার জেল্লা কম নয়। বড় বেশি করে চোখ টানে।

সম্মোহিতের মতো নিজের সর্বনাশকে হাতে তুলে নেওয়ার তীব্র ইচ্ছে হল সারিকার। ওর অনুরোধে সেল্‌সম্যানটি লকেটটা তুলে দিল ওর হাতে।

এক মুঠো আগুন।

রক্তাভ শীতল তার দীপ্তি।

পাথরটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে হঠাৎই ওর চোখ পড়ল দোকানের দরজার দিকে। ভিড়ের মাঝে ভাসমান একটা মুখের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল। চেনা মুখ। নিশীথের মুখ। সুতরাং সম্মোহনের অতল সাগর থেকে ভেসে উঠল সারিকা। পরিচয়ের হাসি হাসল। আজও তা হলে দেখা হয়ে গেল নিশীথের সঙ্গে!

সারিকার ভালো লাগল।

মাত্র এক মাস হল ও দিল্লি থেকে আবার কলকাতায় এসেছে। কলকাতায় ভবানীপুরে ওর পিসিমারা থাকেন। পিসিমা, পিসেমশাই আর ওঁদের একমাত্র ছেলে সম্রাট। ওঁদের ঠিক ওপরের ফ্ল্যাটেই থাকে নিশীথ—নিশীথ সান্যাল।

সারিকা যখনই কলকাতায় আসে তখনই নিশীথের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়। ওর সঙ্গে সারিকার পরিচয় প্রায় বছরখানেকের। তবে সে-পরিচয় নেহাতই সাধারণ ছিল। কিন্তু এবারে কেন যেন সারিকার মনটা বদলে যাচ্ছে, বদলে গেছে।

কলকাতায় বেড়াতে এসে শহরটার বেশ পরিবর্তন লক্ষ করেছে সারিকা। আগের চেয়ে আরও জমকালো হয়েছে কলকাতা। ভিড়ও বেড়েছে।

বাবা মারা যাওয়ার পর, বছরচারেক হল, ও মাকে সঙ্গে করে চলে গেছে

দিল্লিতে। সেখানে ওর মামারা থাকেন। ছোটমামা আর বড়মামা। তাঁদের পরিবারে একসঙ্গে থেকে ও বি. এসসি. পাশ করেছে দিল্লি য়ুনিভার্সিটির আন্ডারে। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর পর, রীতি অনুযায়ী, সারিকাকে পাত্রস্থ করতে তৎপর হয়েছেন মা এবং মামারা। সারিকা নীরবে মত দিলেও প্রয়োজনের বেশি উৎসাহ দেখায়নি। তারপর পেল পিসেমশাইয়ের চিঠি : 'অনেক দিন তোদের দেখি না। তোর মাকে নিয়ে বেড়াতে চলে আয়। তোর পিসিমার শরীর বিশেষ ভালো নেই। তোদের কাছে পেলে খুশি হবে।'

সুতরাং মাকে নিয়ে সাময়িকভাবে কলকাতায় এসেছে সারিকা।

নিশীথের সঙ্গে ওর প্রথম আলাপ হয়েছিল অদ্ভুতভাবে।

পাতিল ম্যানসনের ছ'তলায় তিন-বেডরুমের ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন পিসিমারা। আর সাততলায় নিশীথ। একদিন মাকে নিয়ে কোথায় যেন বেড়াতে বেরিয়েছিল সারিকা। সন্ধে নাগাদ ফিরে এসে একতলার লিফটে যখন উঠল, তখন দেখল ওঁদের সহযাত্রী পঁচিশ-ছাব্বিশের এক যুবক। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, সরু গোঁফ। ঠোঁট দুটো যেন কম-কথা-বলব প্রতিজ্ঞায় অবিচল। চশমার কাঁচের পিছনে কালো চোখের তারা ভীষণ অস্থির।

'ক'তলায় যাবেন?'

'ছ'তলায়।' যুবকের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিয়েছিল সারিকা।

অটোমেটিক এলিভেটর। বোতাম টিপতেই নিঃশব্দে ওপরে উঠতে শুরু করেছে যন্ত্রযান। সারিকার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। মাঝপথে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে না তো লিফটটা! ওর মুখে সম্ভবত আশঙ্কার ছাপ ফুটে থাকবে, কারণ হঠাৎ সামান্য হেসে স্পষ্ট স্বরে যুবকটি বলে উঠল, 'মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, যন্ত্র করে না।'

লজ্জা পেয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়েছিল সারিকা। ছ'তলায় লিফট থামতেই তাড়াতাড়ি মাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। লিফটের দরজা তখন আবার বন্ধ হয়ে গেছে।

সেই প্রথম।

তারপর থেকে যখনই কলকাতায় আসে যাওয়া-আসার পথে নিশীথের সঙ্গে ইতস্তত কথাবার্তা হয়। এরই নাম কি গভীরতর আলাপ? তখন সারিকা জেনেছে নিশীথ 'মডার্ন মেশিন টুল্‌স'-এর সেল্‌স অ্যান্ড সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার। সাততলায় মাসতুতো দাদা-বউদির সঙ্গে থাকে। তবে এবারে ওঁরা শান্তিনিকেতনে নিশীথের নিজের দিদির বাড়ি বেড়াতে যাওয়ায় নিশীথ একাই আছে। রান্নাবান্নার জন্য রয়েছে শুধু একজন ঠিকে কাজের লোক।

নিশীথ সম্পর্কে এই প্রথম সারিকার একটা অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। নিশীথের দিকে ও আগের মতো আর সরাসরি তাকাতে পারে না। কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। কিন্তু তবুও নিশীথের সঙ্গে কথা বলতে ওর ভালো লাগে। নিশীথ ওর সম্পর্কে কী ভাবে তা ও স্পষ্ট জানে না, তবে...।

সারিকার পরিচয়ের হাসির উত্তরে কয়েক মুহূর্ত নির্বিকার রইল যুবকটির মুখ। তারপর বিব্রতভাবে একটা আধো-হাসি ছুড়ে দিল সে।

'আরে, নিশীথবাবু, আপনি!' বিস্ময় মেশানো খুশিতে বলে উঠল সারিকা, 'দেখলেন তো, আবার কেমন এখানে দেখা হয়ে গেল!'

হতভম্ব যুবকের মুখমণ্ডলে কয়েক সেকেন্ড ধরে অভিব্যক্তির খেলা চলল। তারপর হঠাৎই দিলখোলা হাসল সে।

'আপনাকে দেখেই তো ঢুকে পড়লাম।' ভিড় ঠেলে সারিকার কাছে এগিয়ে এল নিশীথ। চুনিটার দিকে চোখ পড়তেই ও থমকাল।

নিশীথের কথায় খুব অবাক হয়েছে সারিকা। নিশীথ ওকে 'তুমি' বলে। তা হলে আজ হঠাৎ এ 'আপনি'র দূরত্ব কেন! আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে না তো? ভাবল ও।

নিশীথের নজর অনুসরণ করে হাতের মালাটার দিকে চোখ নামাল সারিকা। প্রশ্ন করল, 'পছন্দ হয়?'

'অপূর্ব!' প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত নিশীথ। হয়তো প্রয়োজনের বেশিই উচ্ছ্বসিত।

'পাথরটার প্রশংসা করতেই হয়,' বলল সারিকা, 'তবে এই সরু চেনের সঙ্গে এটা বড্ড বেমানান।'

'আপাতত বেমানান লাগছে, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। দারুণ মানাবে আপনার গলায়—চোখ বুজে কিনে ফেলুন। এ-সুযোগ ছাড়বেন না।'

এবার অবাক হয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল সারিকা। এ তো ঠাট্টা নয়! যে নিশীথ ওর সঙ্গে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এসেছে বেশ কিছুদিন, আজ হঠাৎ কোন আজব কারণে ওর 'তুমি' থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে 'আপনি'তে প্রত্যাবর্তন!

সারিকার বিস্ময় নিশীথের নজরে পড়ল। অস্বস্তিভরে ও প্রশ্ন করল, 'কী হল?'

'না, কিছু না।'

দোকানের বাইরে বেরিয়েই প্রশ্নটা নিশীথকে করা যাবে। এখন এই ভিড়ের মাঝে নয়। ভাবল সারিকা। তারপর সামনে দাঁড়ানো সেল্‌সম্যানকে জিগ্যেস করল মালাটার দাম। সে জানাল, ওই সারির সব মালার দামই পঁচিশ টাকা।

পলিথিনের ব্যাগটা নিশীথের হাতে তুলে দিতে গেল সারিকা। কিন্তু অবাক

হয়ে দেখল ও পকেট থেকে টাকা বের করছে—বোধহয় পাথরের লকেটটার দাম দেওয়ার জন্য।

'এ কী, আপনি দাম দিচ্ছেন কেন!' সারিকার স্বরে কিছুটা তিরস্কার লুকিয়ে ছিল।

থতমত খেয়ে গেল নিশীথ। পকেট হাতড়ানো ছেড়ে এগিয়ে দেওয়া পলিথিনের ব্যাগটা হাতে নিল।

সন্দেহ আর বিস্ময়ের কাঁটা মনে চেপে রেখে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট সেল্‌সম্যানটির হাতে দিল সারিকা। সে টাকা ও মালাটা নিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে চলে গেল।

'মালাটা আমার কেনার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে ছিল না।' ভাবল সারিকা, 'শুধু নিশীথের আগ্রহের জন্যেই—ওকে খুশি করার জন্যেই—আমি লকেটটা কিনে ফেললাম।'

সেল্‌সম্যান আবার ফিরে আসায় ওর চিন্তায় বাধা পড়ল।

'হিয়ার ইট ইজ, মিস।' ক্যাশমেমো, ফেরত টাকা ও একটা সুদৃশ্য বাক্স সারিকার দিকে এগিয়ে দিল সে। নিশীথের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ একটু হাসল, বলল, 'আবার আসবেন—।'

ওরা দুজনে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। সামনের রাস্তায় শ্লথগতি গাড়ির সার। তারপরেই কার পার্ক। ক্রিসমাসের সময় বলেই হকারের সংখ্যা অনেক বেশি। কারও হাতে কাগজের ফুল, কারও হাতে বাঁশের ঝুড়ি। সব মিলিয়ে ব্যস্ত পরিবেশ। ক্রিসমাসটা ক্রমে বাঙালিদের উৎসবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ভাবল সারিকা। পাশ ফিরে নিশীথের মুখের দিকে দেখল ও।

এত কাছ থেকে এত খুঁটিয়ে নিশীথকে আগে কি কখনও ও দেখেছে? সরু ফ্রেমের চশমা, সরু গোঁফ, ফরসা বাঁ গালে একটা ছোট আঁচিল। সত্যিই আশ্চর্য! একটা লোককে খুঁটিয়ে দেখা আর এমনি রোজ দেখার মধ্যে কত না পার্থক্য!

লজ্জা পেয়ে হাসল সারিকা। কিন্তু পরমুহূর্তেই আসল প্রশ্নটা মনে উঁকি মারতেই ও বলে বসল, 'নিশীথবাবু, আমাদের এতদিনের আলাপ, অথচ আপনি আজ আমাকে হঠাৎ "আপনি" করে কথা বলছেন কেন?'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ—মানে এমনি,' অপ্রস্তুতের চূড়ান্ত নিশীথ : 'হঠাৎ কী খেয়াল হল, তাই—তুমি রাগ করোনি তো, সু?'

'"সু" মানে!' নতুন সম্বোধন শুনে সারিকা হতবাক।

'কেন, ছোট্ট এই নামটা অপছন্দ?' হেসে জিগ্যেস করল নিশীথ, 'তুমি রেগে গেলে নাকি?'

'না, রাগ করব কেন!' সারিকার বিস্ময় তখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি।

'এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে।' সরল হাসল নিশীথ। ওর কথায় অন্তরঙ্গতার সুর হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে পড়ল।

পাশাপাশি হেঁটে রাস্তা পার হল ওরা।

ঠিক সেই সময়েই ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিক থেকে লোকজনের চিৎকার আর গোলমালের শব্দ ওদের কানে ভেসে এল।

নিশীথ তাকিয়ে দেখল এফ. সি. আই. অফিসের সামনে এক বিরাট জটলা। যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝে-মধ্যে হেলমেট পরা ট্র্যাফিক পুলিশের মাথা উঁকি মারছে।

সারিকা চিরকালই গণ্ডগোল এড়িয়ে চলতে ভালোবাসে। জনকোলাহল ওর দু-চক্ষের বিষ, কিন্তু আগ্রহ দেখাল নিশীথই। বলল, 'চলো, দেখা যাক কী হল।'

সারিকা নীরবে নিশীথকে অনুসরণ করল।

ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে সারিকাকে এক পাশে দাঁড়াতে বলল নিশীথ।

'তুমি এখানে দাঁড়াও। এখানে একটা বিশ্রী অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। সে-দৃশ্য তুমি সইতে পারবে না।'

ওকে রেখে ভিড় ঠেলে ঢুকে গেল নিশীথ। কোনওরকমে অকুস্থলে উঁকি মারল।

চামড়ার জ্যাকেট পরা একটা মানুষের দেহ তালগোল পাকিয়ে পড়ে রয়েছে রাস্তায়। নিঃসন্দেহে মারা গেছে। লোকটিকে শনাক্ত করার তেমন কোনও উপায় আর নেই। ভাঙাচোরা মুখটা রক্তে ভেজা।

নিশীথের মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। এ-জ্যাকেট ওর অনেক চেনা। এই বিধ্বস্ত অবস্থাতেও মরা মানুষটাকে ও বোধহয় চিনতে পারছে। কী করে মারা গেল লোকটা? তা হলে কি...?

'মনে হয় মাল টেনে রাস্তা পার হচ্ছিল।' জনৈক দর্শক মন্তব্য করল।

'কে জানে, কেউ হয়তো পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে। কারণ ভদ্রলোককে আমি এই লাইট-পোস্টটার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম।' বক্তা জনৈক কাঁচা-পাকা চুল প্রৌঢ়।

'গাড়িটা চাপা দিয়ে এস. এন. ব্যানার্জি রোডের দিকে পালিয়ে গেছে—।'

'হ্যাঁ, একটা কালো রঙের শেভ্রলে গাড়ি—।'

ভিড় সরিয়ে বাইরে এল নিশীথ। পা দুটো কেমন অসম্ভব ভারি ঠেকছে। ওর চোখে পড়ল, সামনেই একটা পানের দোকানের সামনে গোলাপী গাউন পরা একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে একটা সাদা ঠোঙা, মাথার চুল ধবধবে সাদা, সঙ্গে একটা পিকিনিজ কুকুর। তিনি গম্ভীর

মনোযোগের সঙ্গে পাশে দাঁড়ানো এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে কী যেন আলোচনা করছেন। ভদ্রলোকের চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা, হাতে ব্রিফকেস।

সারিকার পাশে এসে দাঁড়াল নিশীথ। বলল, 'চলো, ওখানে একটা লোক গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে।'

'গাড়িটাকে পুলিশ ধরতে পারেনি?' জানতে চাইল সারিকা।

'না, সু, পালিয়ে গেছে।' অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল নিশীথ।

নিশীথকে আজ যেন ভীষণ অচেনা লাগছে। ভাবল সারিকা। অবশ্য নিশীথকে ও কখনও ওর মনের কথা বুঝতে দেয়নি। আসা-যাওয়ার পথে ওর সঙ্গে দেখা হলে নিশীথ যেসব কথা বলে তা নিতান্তই মামুলি। তার মধ্যে কোনওরকম দুর্বলতা কখনও সারিকা টের পায়নি। কিন্তু নিশীথ কি সারিকার মনের কথা আঁচ করতে পারে না? এতই সরল ও! তা হলে ওকে আজ হঠাৎ ছোট্ট নতুন নামে ডাকছে কেন!

লিন্ডসে স্ট্রিট ধরে ওরা চৌরঙ্গী রোডের দিকে এগোতে শুরু করল। ওদের পাশ কাটিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স আর একটা নীল রঙের পুলিশ-ভ্যান ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে ছুটে গেল।

হঠাৎই সারিকা প্রশ্ন করল, 'বাড়ি ফিরবেন তো?'

এ-প্রশ্নের উত্তর থেকেই নিশীথের মনের আসল ইচ্ছেটা জানা যাবে। বোঝা যাবে সারিকার সঙ্গ ওর ভালো লাগছে কি না। সারিকার মুখে কিশোরীর আগ্রহ কি ও খুঁজে পাচ্ছে না? লাজুক ছেলেদের নিয়ে এই এক মুশকিল! মনে-মনে হাসল সারিকা। নাকি ও নিজেই বড্ড বাড়াবাড়ি করছে?

'বাড়ি?' ভীষণভাবে চমকে উঠল নিশীথ। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'বাড়ি কেন? চলো, কোথাও একটু বসা যাক। একটু চা-টা খাওয়া যাক।' একটু থেমে তারপর : 'আপত্তি নেই তো?'

'চলুন—'বেশি আগ্রহ দেখানোটা ঠিক হবে না। নিশীথের কাছ থেকে এ ধরনের আমন্ত্রণ এই প্রথম। মনের খুশিকে অতি কষ্টে চেপে রাখল সারিকা।

গ্লোব, দে'জ মেডিকেল পার হয়ে 'বাদশা'য় পৌঁছল ওরা।

ভেতরে ম্লান আলোর খেলা। ফ্রাই ও রোলের সুগন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারছে।

দু-পাশের কাচের দেওয়ালের মাঝে সরু প্যাসেজে পা রাখল নিশীথ। সারিকা ওকে অনুসরণ করল।

একটা চারজনের টেবিল সৌভাগ্যবশত খালি পাওয়া গেল। ওরা বসল।

সারিকা নিশীথকে লক্ষ করতে লাগল।

নিশীথের গায়ে ফুলহাতা হলুদ সোয়েটার। তার ওপরে কালো কাজ করা।

'এই সোয়েটারটা আগে কখনও ওকে পরতে দেখিনি।' ভাবল সারিকা, 'ওকে যেন বড় বেশি অস্থির মনে হচ্ছে।'

হাতের পলিথিন-ব্যাগটা নিশীথ টেবিলের এক পাশে নামিয়ে রাখল। দেখাদেখি সারিকাও লকেটের বাক্সটা তার পাশে রাখল। এমন সময় বেয়ারা এসে টেবিলের পাশে দাঁড়াল। খাবারের অর্ডার দিল নিশীথ। অবশ্য দেওয়ার আগে সারিকার পছন্দ জেনে নিতে ভুলল না। চিকেন রোল আর কফি।

দুজনেই চুপচাপ। যেন সব কথা ফুরিয়ে গেছে। হঠাৎই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নিশীথ। বলল, 'এক মিনিট, সু, আমি এক্ষুনি আসছি—।'

সারিকার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ও বেরিয়ে গেল। অবাক হয়ে ওর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইল সারিকা।

মিনিটপাঁচেক কেটে গেল, নিশীথের ফিরে আসার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

এটা-ওটা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মালার বাক্সটা খুলল সারিকা। ভেতর থেকে বের করল লাল পাথর বসানো হারটা।

এই অল্প আলোতেও পাথরটা হায়নার চোখের মতো ধকধক করে জ্বলছে। এরপর সব মেয়েই যেটা করত সেই কাজই করে বসল সারিকা। মালাটা গলায় পরল। আর ওর গলার সাদা পুঁতির হারটা খুলে ভরে রাখল বাক্সে। নিশীথ এলে জিগ্যেস করবে ওকে কেমন মানিয়েছে।

সারিকার পরনে সবুজ প্রিন্টের শাড়ি, তার ওপর কালচে ফারের কোট। দিল্লিতে যাওয়ার পর বড়মামা কিনে দিয়েছিলেন। কলকাতার শীতে হয়তো সামান্য বাহুল্য।

কোটটা পরতেই জ্বলন্ত লাল পাথরটা হারিয়ে গেল ওর ফারের কলারের আড়ালে। বুকের কাছে পাথরটার ঠাণ্ডা পরশ অনুভব করল ও। আর বুকের ভেতরে নিশীথের জন্য চিন্তা।

'বসতে পারি?'

কানের কাছে আচমকা সম্বোধনে চমকে উঠল সারিকা। চোখ ফেরাতেই দেখল ওর টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একজন বেঁটেখাটো বলিষ্ঠ পুরুষ। গায়ের রঙ টকটকে ফরসা। পরনে ফুলহাতা শার্ট, কালো সোয়েটার, গরম প্যান্ট। চোখ দুটো অস্বাভাবিকরকম ছোট। মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা। মুখে এক অদ্ভুত সবজান্তা হাসি।

সারিকা-নিশীথের টেবিলটা চারজনের। রেস্তরাঁর অন্যান্য টেবিলও খালি নেই। সুতরাং ঘাড় নেড়ে আগন্তুককে বসতে বলল সারিকা।

সারিকার অনুমতি পেয়ে নিখুঁত ভঙ্গিতে গুছিয়ে বসল লোকটি। দু-হাত টেবিলে রাখল।

'ম্যাডাম কি একাই আছেন?' ভাঙা বাংলায় প্রশ্ন করল লোকটি। তার কণ্ঠস্বর কেমন অদ্ভুত ফিসফিসে।

'না, সঙ্গে আমার এক বন্ধু আছেন। এখুনি এসে পড়বেন।' নিজের বিব্রত ভাবটা কাটিয়ে মনে সাহস আনতে চেষ্টা করল সারিকা। এমন সময় ওর চোখ পড়ল আগন্তুকের ডান হাতের উলটোপিঠে। ফরসা হাতে অদ্ভুত স্পষ্টভাবে উল্কি দিয়ে আঁকা রয়েছে একটা আক্রমণোদ্যত বেড়ালের ছবি।

জীবন্ত ছবিটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে কতক্ষণ যে তাকিয়ে ছিল সারিকার খেয়াল নেই। চমক ভাঙল লোকটির কথায়, 'জীবন্ত ছবি, তাই না?'

'হ্যাঁ—' অস্বস্তি-আশঙ্কা মেশানো স্বরে বলল সারিকা।

'এর একটা বিশেষ অর্থ আছে, ম্যাডাম,' হাসল লোকটি : 'যে-লোকের উরুতে এই বেড়ালের ছবি উল্কি দিয়ে আঁকা থাকে, তার চলাফেরার সময় কোনওরকম শব্দ হয় না। আর যার হাতে এই উল্কি থাকে, তার নখের আঁচড় হয় গভীর। কখনও সে-আঁচড়ের দাগ মিলিয়ে যায় না।'

সারিকার মনে পড়ল, লোকটি যখন ওর টেবিলে এসে হাজির হয়, তখন কোনওরকম পায়ের শব্দ ও পায়নি। ও চুপ করে রইল। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডের ঢিপঢিপ শব্দ ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে।

লোকটি হঠাৎই উঠে দাঁড়াল।

'চলি, ম্যাডাম। একজনের এখানে আসবার কথা ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে বোধহয় আর দেখা হল না। হয়তো ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গেই আর-একবার দেখা হয়ে যাবে।' মৃদু হাসল সে।

এবার বিরক্ত হল সারিকা। বলল, 'সেরকম কোনও চান্স নেই।'

'ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না, ম্যাডাম।' কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না লোকটি। ক্ষিপ্র নিঃশব্দ পদক্ষেপে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অবাক চোখে তার দিকে চেয়ে রইল সারিকা।

হঠাৎই ও দেখতে পেল নিশীথকে।

বাদশার দরজায় একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছে। সেটা থেকে নেমে দাঁড়াল নিশীথ। ইশারায় ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে রেস্তরাঁর ভেতরে ঢুকল ও। ঢোকার মুখে অচেনা আগন্তুকের সঙ্গে সামান্য ধাক্কা লাগল নিশীথের।

'সরি—' বলে পাশ কাটিয়ে গেল আগন্তুক।

বেয়ারা ইতিমধ্যে টেবিলে চিকেন রোল সার্ভ করে গেছে। নিশীথ

হন্তদন্তভাবে এসে দাঁড়াল টেবিলের কাছে।

সারিকা নির্বিকার মুখে অভিমান ভরা চোখে চুপচাপ বসে ছিল। নিশীথ বলল, 'রাগ কোরো না, সু, প্লিজ। ট্যাক্সি করে এক বন্ধুকে এগিয়ে দিয়ে এক্ষুনি আসছি। পাঁচ মিনিট। তুমি দেখো—।'

ঝড়ের মতোই আবার বেরিয়ে গেল নিশীথ।

প্রথমবার ও না হয় ট্যাক্সি ডাকতে গিয়েছিল, কিন্তু এখন কোথায় যাচ্ছে? ভাবল সারিকা। তারপর বেয়ারাকে ডেকে নিজেই বিল মিটিয়ে দিল।

আশ্চর্য, ওকে এভাবে ফেলে রেখে চলে যেতে নিশীথ সান্যালের লজ্জা করল না! সারিকার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু তবুও অপেক্ষায় রইল ও।

মিনিটদশেক পর হঠাৎই সারিকার নজরে পড়ল টেবিলে হারের বাক্সটা নেই।

কোথায় গেল? নিচু হয়ে টেবিলের তলায় দেখল সারিকা।

নেই।

আশেপাশে কোথাও পড়ে যায়নি তো! খোঁজাখুঁজি করে বুঝল, না পড়ে যায়নি। তবে কি কেউ নিয়ে গেছে বাক্সটা? ওর মধ্যে যে সারিকার সাদা পুঁতির মালাটা রয়েছে! এ পর্যন্ত টেবিলের কাছে এসেছে তিনজন।

'বাদশা'র বেয়ারা। সেই আগন্তুক। এবং নিশীথ।

প্রথমজনকে সহজেই বাদ দেওয়া যায়। দ্বিতীয়জন টেবিল ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও বাক্সটা যে টেবিলে ছিল সেটা সারিকার স্পষ্ট মনে আছে। তা হলে কি...?

দ্বিধাগ্রস্ত বহু মুহূর্তের পর সিদ্ধান্তে এল সারিকা। বাক্সটা নিশীথই হাতে করে নিয়ে গেছে। কিন্তু কেন?

আরও দশ মিনিট কেটে গেল, নিশীথ এল না।

এতক্ষণ ধরে করছে কী ও?

চিন্তিতভাবে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল সারিকা। খাওয়ার ইচ্ছে আর নেই। পলিথিনের ব্যাগটা গুছিয়ে হাতে নিল। এগিয়ে গেল রেস্তরাঁর ক্যাশ কাউন্টারের দিকে। চকিত দৃষ্টিতে বাদশার বাইরের ফুটপাতে বারকয়েক নজর রাখল ও। না, নিশীথের চিহ্নমাত্রও সেখানে নেই। যে-ট্যাক্সি করে নিশীথ ফিরে এসেছিল সে-ট্যাক্সিটাও নেই।

কাউন্টারের ভদ্রলোককে সংক্ষেপে সব ঘটনা জানিয়ে ও বলল, 'তিনি যদি ফিরে আসেন, তা হলে বলে দেবেন আমি বাড়ি চলে গেছি। এই যে ভদ্রলোকের

নাম-ঠিকানা।'

একটা সাদা প্যাডের কাগজে নিশীথের নাম-ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখে দিল ও। তারপর সৌজন্যের মিষ্টি হাসি হেসে বেরিয়ে এল বাদশা থেকে।

নিশীথ বলে গেল, 'এক্ষুনি আসছি।' তা হলে এতক্ষণেও ফিরে এল না কেন? হারের বাক্সটাই বা ও নিয়ে গেল কেন? কোনও বিপদে পড়েনি তো নিশীথ!

সারিকার বুক কেঁপে উঠল। সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে ধরল ও। কিন্তু কোনও লাভ হল না।

অবশেষে চিন্তিত মুখে ও রওনা দিল বাড়ির দিকে। নিশীথের ওপর রাগ আর অভিমান কেটে গিয়ে এখন দুশ্চিন্তা ক্রমশ ওর মনে জায়গা করে নিচ্ছে।

ভিড়ে ঠাসা ফুটপাত ধরে হেঁটে চলল সারিকা। নিজের অন্যমনস্কতায় আর চারদিকের কলগুঞ্জনে একটা বিশেষ শব্দ ওর কান এড়িয়ে গেল।

সারিকা যদি কান পেতে শুনত, তা হলে শুনতে পেত মর্স কোডে ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম অক্ষরের নিটোল ছন্দ : ডট—ড্যাশ....ডট—ড্যাশ...।

যেন কেউ খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাটছে, পা টেনে এগিয়ে চলেছে জনবহুল ফুটপাত ধরে—ঠিক সারিকার পিছু-পিছু।

॥ তিন ॥

সাতচল্লিশের 'এ' বাস থেকে এলগিন রোডে ভবানীপুর কলেজের কাছে নামল সারিকা। পিসেমশাইয়ের কাছে শুনেছে কলেজটা অ্যাংলো গুজরাট সোসাইটির—পুরোভাগে আছেন বিড়লা এবং মাত্র বছরদশেকের পুরনো। এঁদেরই অ্যাংলো গুজরাট স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে সম্রাট। ওকে স্কুল পালটে সেন্ট জেভিয়ার্সে দেওয়ার কথা ভাবছেন পিসেমশাই, কিন্তু স্কুলটা দূরে বলে পিসিমার আপত্তি।

এখন এলগিন রোড নির্জন। কারণ সময় প্রায় সাড়ে সাতটা, তার ওপর শীতকাল। এই নির্জনতা সারিকার চেনা। দিল্লি যাওয়ার আগে ওরা কলকাতার সি. আই. টি. রোডে থাকত। সেখানেও নির্জনতা। আর দিল্লি তো নির্জনতার জ্বলন্ত উদাহরণ! এখন, অবশেষে, এই এলগিন রোড-অ্যালেনবি রোড অঞ্চল।

রাস্তা পার হয়ে ফুটপাত ধরে হাঁটতে শুরু করল সারিকা। নতুন তৈরি হওয়া একটা বাড়ি পার হয়ে বাঁদিকে অ্যালেনবি রোডে ঢুকল। দুটো বাড়ি

পরেই দাঁড়িয়ে আছে পাতিল ম্যানসন।

সাদা রঙ করা বিশাল লোহার দরজা। সেখান থেকে সিমেন্ট বাঁধানো ফুটপাত ঢালু হয়ে এসে মিশেছে রাস্তায়—গাড়ি ঢোকা-বেরোনোর জন্য। লোহার দরজার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে বিরাট ড্রাইভওয়ে। তার একপাশে সবুজ ঘাসে ছাওয়া বড় লন। লনের পরিসীমায় মরসুমি ফুলের বাহার। এবং ঠিক মাঝখানে নিঃসঙ্গ চোখের মতো সিমেন্ট বাঁধানো একটা ছোট্ট আইল্যান্ড। তার মাঝে এক বিশাল পলাশ গাছ। ডান দিকে, ড্রাইভওয়ের পাশে, দাঁড়িয়ে রয়েছে সাততলা পাতিল ম্যানসন। তার বিভিন্ন ফ্ল্যাটের আলো কাচের জানলা দিয়ে চোখে পড়ছে। সে-আলো এসে মিশেছে লনের লাইটপোস্ট দুটোর আলোর সঙ্গে। তারপর তারা অন্ধকার-অভিযানে বেরিয়ে মিলিত হয়েছে সদর দরজার ওপরে ঘষা প্লাস্টিকের মুখোস পরা প্রহরী বাল্‌বের সঙ্গে।

লোহার দরজা কিছুটা খোলা—যেমনটা রোজই থাকে। সুতরাং ভেতরে ঢুকল সারিকা। দারোয়ানগুলোর একটাকেও নজরে পড়ল না। বোধহয় কোনও সান্ধ্য মজলিসে ফূর্তি করতে গেছে।

সহজ পায়ে ড্রাইভওয়ে পার হয়ে পাতিল ম্যানসনে ঢুকল সারিকা। পালিশ করা ভারি কাঠের সদর দরজা অতিক্রম করেই দু-ধাপ সিঁড়ি। তারপর বাঁদিকে অটোমেটিক এলিভেটর। এলিভেটরে ঢুকে বোতাম টিপতেই স্বয়ংক্রিয় রবারের লাইনিং দেওয়া দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর পাঁচ নম্বর সুইচ টিপল সারিকা। একটা আচমকা মৃদু ঝাঁকুনি। ধাতব দরজায় বসানো একটুকরো চৌকো কাচের জানলা দিয়ে চোখে পড়ল সরীসৃপের মতো নীচে নেমে যাওয়া দেওয়াল। তার গায়ে বিভিন্ন তলায় ইংরাজিতে এক, দুই...লেখা।

নিশীথের কথা ভাবতে-ভাবতেই মাথার ওপরে তাকাল সারিকা। একটা উজ্জ্বল বাল্‌ব ঘোলাটে সিলিংয়ের গায়ে দপদপ করে জ্বলছে। কিন্তু কোথাও কোনও ভেন্টিলেটার নজরে পড়ছে না তো! শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য বাতাস কোন দিক দিয়ে ঢুকবে? ভেতরে যা বাতাস আছে তা এইটুকু সময়ের জন্য যথেষ্ট তো? মনে পড়ল, নিশীথ বলেছিল, মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, যন্ত্র করে না। না করলেই ভালো।

কিন্তু নিশীথ হঠাৎ উধাও হল কোথায়? ও কি বাড়িতে ফিরে এসেছে? হয়তো সেই বন্ধু ওকে ছাড়তে চায়নি। আর দেরি হওয়ায় নিশীথ ভেবেছে, সারিকা নিশ্চয়ই বাড়ি চলে গেছে।

হঠাৎই খুব গরম মনে হল এলিভেটরের আবহাওয়া। সারিকা গা থেকে কোটটা খুলে হাতে নিল। চোখ বোলাল এলিভেটরের চারপাশে। যদি মাঝপথেই আচমকা এই যন্ত্রযান বন্ধ হয়ে যায়! একটা অদ্ভুত আতঙ্ক ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে

জড়িয়ে ধরতে চাইল।

অবশেষে লিফট যখন ছ'তলায় এসে থামল, তখন স্বস্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল সারিকার বুক ঠেলে। লিফটের দরজা নিজে থেকেই খুলে গেল। বাইরের করিডরে এসে দাঁড়াল ও। এগিয়ে চলল নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজা লক্ষ্য করে। তারপর দরজার কলিংবেল টিপল।

এ-বাড়িতে প্রতি তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট। ডানদিকের ফ্ল্যাটে থাকেন এক মহিলা। নাম জারিন আগরওয়াল। একটা নামকরা গারমেন্ট্‌স কোম্পানির ডিজাইনার। সারিকার সঙ্গে ওর আলাপ মোটামুটি পুরনোই বলা চলে।

নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজার দিকে এগোনোর সময় সারিকা লক্ষ করল জারিনের দরজার নীচ দিয়ে আলোর রেশ দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ, জারিন ফ্ল্যাটেই আছে।

দরজা খুলে দিল মা। মাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল সারিকা। মা দরজা আবার বন্ধ করে দিল।

'কী রে, ফিরতে এত দেরি হল!' মা উদ্বেগের গলায় জিগ্যেস করল।

সারিকা বসবার ঘরের টেবিলের ওপরে পলিথিনের ব্যাগটা রাখল।

মাকে কি সব কথা বলা যায়? বলা যায়, নিশীথ কীরকম আশ্চর্যভাবে উধাও হয়ে গেল!

উঁহু, বললে পরে মা অনর্থক দুশ্চিন্তা করবে। রাতে হয়তো ঘুমোতেই পারবে না।

তাই ও পলিথিনের ব্যাগের জিনিসগুলো একে-একে বের করে টেবিলে রাখল, বলল, 'এসব কেনাকাটা করতে গিয়েই দেরি হয়ে গেল। দ্যাখো, এই টুপিটা সম্রাটের—ও কোথায়?'

'ভেতরের ঘরে—পড়ছে—দিদিমণি এসেছে।'

'তুমি এগুলো পিসিমাদের দেখাও। আমি জামাকাপড় ছেড়ে নিই। সম্রাটের পড়া হয়ে গেলে ওকে টুপিটা দেব।'

সারিকা ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়াল। যেতে-যেতে শুনতে পেল রান্নার শব্দ। রান্নাঘরে পিসিমা রান্না করছেন।

পিসেমশাইয়ের শোওয়ার ঘরটায় উঁকি মারল সারিকা। পিসেমশাই বিছানায় জমিদারি কায়দায় আধশোওয়া হয়ে রেডিয়োতে খবর শুনছেন।

সারিকাকে দেখে হেসে বললেন, 'কী, গোটা নিউ মার্কেটটা কেনা হল?'

'হ্যাঁ—প্রায় সেইরকমই,' হেসে বলল সারিকা, 'ক্রিসমাসের জন্যে যা ভিড়!'

মাকে নিয়ে সারিকা যে-ঘরটায় শোয় সেটা একেবারে কোনার দিকে। তার

পাশের ঘরটায় সম্রাট পড়তে বসেছে। দিদিমণি ওকে পড়াচ্ছে। অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেলেও সম্রাটের ছুটি মেলেনি। অঙ্কে ও ভীষণ কাঁচা। এখন পিসিমার হুকুমে তারই মেরামতি চলছে।

সম্রাটের পড়ার ঘরের দিকে একপলক চোখ বুলিয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়ল সারিকা।

তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছেড়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার কাছে গিয়ে বসে পড়ল ও।

ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল সারিকা। লক্ষ্য গলার চুনিটা। এটা মাকে দেখাতে ও ভুলে গেছে।

এক অদ্ভুত ঘোরে সারিকা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এই সামান্য নকল পাথরের দীপ্তি ওকে বারবার অবাক করল। একইসঙ্গে আবার মনে পড়ল হারিয়ে যাওয়া নিশীথের কথা। ও বাড়ি ফিরে এল কি না সেটা খোঁজ করা দরকার।

প্রথমে ও ঠিক করল, সোজা ওপরে নিশীথের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখবে ও ফিরেছে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই কী ভেবে মত পালটাল। ও সোজা এগিয়ে গেল বসবার ঘরে। ঘরের এক কোনে ছোট টিপয়ের ওপর বসানো টেলিফোন। পাশেই ছোট মাপের টেলিফোন-বই।

নিশীথের ফোন নম্বর খুঁজে বের করে সতর্ক আঙুলে ডায়াল করল ও।

একটু পরেই কানে-চাপা রিসিভারে শোনা গেল 'ক্রিং-ক্রিং' শব্দ।

সেকেন্ড দশেক পর কেউ এসে অপর প্রান্তে রিসিভার তুলে নিল।

সারিকা উৎকণ্ঠ, কৌতূহলে উদগ্রীব।

'হ্যালো—' গম্ভীর পুরুষ-কণ্ঠস্বর।

'কে, নিশীথ?'

'আপনার কত নম্বর চাই?'

'৪৬-৩৫১৬।' ভয়ে-ভয়ে বলল সারিকা।

'সরি, রং নাম্বার—।'

কট করে লাইন কেটে দেওয়ার শব্দে ভীষণ অপমানিত বোধ করল ও। সেই সঙ্গে মনে একটা সন্দেহও দানা বাঁধতে শুরু করল। সত্যিই কি ওর 'রং নাম্বার' হয়েছে?

উঁহু—অসম্ভব। কিন্তু নিশীথই যদি ফোন ধরে থাকবে, তা হলে অমন অভদ্রের মতো লাইন কেটে দেবে কেন? তা হলে কি অন্য কেউ নিশীথের ফ্ল্যাটে ঢুকেছে?

দ্বিধাগ্রস্ত মনে আবার নিশীথের নম্বর ডায়াল করল ও।

কিন্তু ফোন বেজেই চলল, কেউ আর ধরল না।

ফোন রেখে দিতে যাবে, এমন সময় ওপরের ঘরে একটা ভারি কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দে চমকে উঠল সারিকা। তা হলে কি ওর সন্দেহই সত্যি? নিশীথ কোনও বিপদে জড়িয়ে পড়েনি তো!

চট করে ফোন নামিয়ে রাখল ও। মাকে বলল, 'আমি জারিনের ঘর থেকে একটু আসছি—।' তারপর একটা শাল নিয়ে গায়ে জড়িয়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। দেখল, জারিনের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। ও এগিয়ে গিয়ে জারিনের দরজায় ধাক্কা মারল। একবার, দুবার—।

দরজা খুলতেই সারিকা দেখল স্লিপিং গাউন পরা জারিন ওর সামনে দাঁড়িয়ে।

'কী ব্যাপার, সারি?'

'জারিন, আমার—আমার মনে হয়, ওপরে নিশীথবাবুর ফ্ল্যাটে কেউ ঢুকেছে।'

যদি পুরো ব্যাপারটাই আমার মনের ভুল হয়, তা হলে! মনে-মনে ভাবল সারিকা। তা হলে এ নিয়ে হাসাহাসির সীমা থাকবে না।

'তার মানে?' জারিনের ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল।

সারিকা সংক্ষেপে ওকে সন্ধেবেলার সব ঘটনা জানাল।

সব শুনে জারিন হাসল : 'চিন্তার কিছু নেই, সারি। এই ভ্যানিশ হওয়ার ব্যাপারটার একটা সিম্পল এক্সপ্লানেশান আছে—অবশ্য যদি তুমি কিছু মনে না করো তা হলে বলছি—।'

'আমি জানি তুমি কী বলবে।' জারিনকে বাধা দিয়ে বলে উঠল সারিকা, 'কিন্তু একটা কথা তুমি হয়তো ঠিক জানো না, জারিন—নিশীথবাবুর সঙ্গে আমার রিলেশান এমন কিছু থিক নয় যে, আমাকে অ্যাভয়েড করার জন্যে ওঁকে ওরকম চালাকি করতে হবে। নেহাত উনি আমাদের জানাশোনা, তাই চিন্তা করছি—তার বেশি কিছু নয়। তা ছাড়া, একটু আগেই আমি ওঁর ফ্ল্যাটে ফোন করেছিলাম। কে যেন ফোন ধরে ভারি গলায় বলে দিল, রং নাম্বার।'

'হতে পারে, হয়তো সত্যিই তোমার রং নাম্বার হয়েছে।' জারিন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল।

'তা পারে—' চিন্তিত মুখে জবাব দিল সারিকা, 'কিন্তু তার ঠিক পরেই আমি আবার ফোন করেছিলাম। তখন কেউ ফোন ধরল না। অথচ নিশীথবাবুর ফ্ল্যাটে ভারি কিছু উলটে পড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছি।'

'তাই নাকি?' জারিন এবার অবাক হল।

'হ্যাঁ। চলো, আমরা দুজনে একবার ওপরটা দেখে আসি।'

সঙ্গে-সঙ্গেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল জারিন। সারিকার দিকে চেয়ে হাসল : 'চলো। নিশীথের খোঁজ নেওয়া উচিত। আই লাইক হিম।'

সারিকা অবাক চোখে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল জারিনের দিকে।

চুপচাপ ওরা দুজনে পাশাপাশি সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। সারিকার বুক দুরুদুরু—যদি সত্যিই নিশীথের ঘরে কেউ ঢুকে থাকে, তা হলে! ওরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এই রাতের আগন্তুক যদি কোনও অস্ত্র নিয়ে ওদের আক্রমণ করে! তা ছাড়া পিসিমা-পিসেমশাই জানতে পারলেই বা কী ভাববেন!

এই সব এলোমেলো কথা ভাবতে-ভাবতে নিশীথের ফ্ল্যাটের দরজায় এসে দাঁড়াল ওরা। এক মুহূর্ত এ-ওর দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর বুক ভরে এক গভীর শ্বাস টেনে নিয়ে দরজায় নক করল সারিকাই।

কোনও উত্তর নেই।

'নিশীথ—নিশীথ—' কিন্তু জারিনের ডাকের কোনও উত্তরই ভেসে এল না ঘরের ভেতর থেকে।

অগত্যা দরজার হাতল ঘোরাল সারিকা। এবং ওদের অবাক করে দিয়ে বিনা বাধায় দরজা খুলে গেল।

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার—শুধু বাইরের ল্যান্ডিংয়ের একফালি আলো গিয়ে পড়েছে ঘরের ভেতরে। নিশীথের ফ্ল্যাটের ওপরেই বাড়ির ছাদ। সুতরাং সাতনম্বর তলায় ফ্ল্যাটের সংখ্যা একটাই। সাহায্য করার মতো প্রতিবেশী সাততলায় কেউ নেই।

একইসঙ্গে পা ফেলে ঘরের ভেতর পা রাখল জারিন ও সারিকা। হাত বাড়িয়ে জারিন আলোর সুইচ অন করল। উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ল ঘরের মেঝেতে। এবং সেই আলোয় ঘরের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য দেখে একটা অস্ফুট চাপা আর্তনাদ করে উঠল সারিকা।

ঘরটা যেন আধুনিক কুরুক্ষেত্র। সমস্ত আসবাবপত্র জামাকাপড় খুশিমতো যেখানে-সেখানে ছড়ানো। টেবিলের ড্রয়ার, আলমারি—সব খোলা। একটা ভারি চেয়ার ঘরের এক পাশে উলটে পড়ে আছে।

জারিনের দিকে চোখ ফেরাল সারিকা। দেখল, জারিন স্তম্ভিত।

'তা হলে দেখছি আমার কথাই ঠিক। নিশীথবাবুর ঘরে কেউ ঢুকেছিল।' আলতো গলায় বলল সারিকা।

জারিন কোনও জবাব না দিয়ে সোজা চলে গেল নিশীথের শোওয়ার ঘরে।

কেউ নেই।

তারপর বাথরুম, কিচেন।

এবং সেখানেও কেউ নেই।

জারিন একটু পরেই ফিরে এল সারিকার কাছে। ওর মুখে এখন ভয়ের ছাপ।

'ভেতরে কেউ নেই।' জারিনের স্বর স্বাভাবিক নয়, 'আমরা কি পুলিশে খবর দেব?'

'তা ছাড়া আর তো উপায় দেখছি না।' সারিকার মনে তখন চিন্তার ঝড় : 'আমার মনে হয় ওই চেয়ারটা উলটে পড়ার শব্দই আমি শুনেছি। আর, ওই লোকটা নিজের গলার স্বর সাপ্রেস করার জন্যেই অমন গম্ভীর টোনে ফোনে কথা বলছিল।'

জারিন কোনও জবাব দিল না। ও তখনও ঘরের উচ্ছৃঙ্খল চেহারা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে।

সারিকার মনে পড়ল বাদশায় দেখা লোকটির কথা : যে-লোকের উরুতে এই বেড়ালের ছবি উল্কি দিয়ে আঁকা থাকে, তার চলার সময় কোনওরকম শব্দ হয় না। আর, যার হাতে এই উল্কি থাকে, তার নখের আঁচড় হয় গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী।

সত্যিই তো, এই শক্ত বাঁধানো মেঝেতে চলাফেরা করলে একটু-আধটু শব্দ হবেই। অথচ সারিকা শত চেষ্টাতেও সেরকম কোনও শব্দ শোনেনি। তা হলে কি...?

কিন্তু কেন? তবে কি নিশীথ কোনওরকম বেআইনি কাজে জড়িয়ে পড়েছে?

আর বেশি কিছু ভাবতে পারল না সারিকা। তার আগেই জারিনের অস্ফুট চিৎকারে ও চমকে উঠল।

'এটা—এটা তুমি কোথায় পেলে?' জারিনের আঙুল সারিকার গলার দিকে।

'কোনটা?' গলার দিকে চোখ নামাল সারিকা, হাসল : 'ও—এটা! এটা আজই কিনেছি—নিউ মার্কেট থেকে।'

জারিনের চোখে পরিপূর্ণ অবিশ্বাসের দৃষ্টি।

'অত অবাক হওয়ার কিছু নেই। পাথরটা নকল। দাম মাত্র পঁচিশ টাকা।' সারিকা বলল।

'অসম্ভব!' সারিকার কাছে সরে এল জারিন। হাতে নিয়ে পাথরটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরখ করে দেখতে লাগল : 'কে দিয়েছে, নিশীথ?'

'উঁহু—আমি নিজেই কিনেছি।' সারিকার মনে এবার সন্দেহ দেখা দিল।

জারিন হঠাৎই প্রসঙ্গ পালটাল : 'চলো, নীচে গিয়ে থানায় ফোন করা যাক।'

নিশীথের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে ওরা দুজনে নেমে এল নীচে—জারিনের ঘরে। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল জারিন, ডায়াল ঘোরাল : 'হ্যালো, পুলিশ স্টেশন?...'

॥ চার ॥

পরদিন সকালটা পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর দিতে-দিতেই কেটে গেল।

পুলিশ ব্যাপারটাকে একেবারেই তেমন গুরুত্ব দিল না। কেবলই সন্দেহের নজরে সারিকার দিকে তাকাতে লাগল। যেন এই তুচ্ছ ব্যাপারে পুলিশে খবর দিয়েই ও একটা মারাত্মক ভুল করে বসেছে।

নিশীথ সম্পর্কে জারিন আর সারিকা যতটুকু জানে পুলিশকে জানাল। কিন্তু শত খোঁজাখুঁজি করেও নিশীথের কোনও ছবি পাওয়া গেল না।

পুলিশ-দলকে বিদায় দিয়ে ভীষণ ক্লান্তি বোধ করল সারিকা। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে এলোমেলো ভাবনা ভেবে চলল।

গতকাল জারিনের ফ্ল্যাট থেকে ফিরে এসে অনেকক্ষণ দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছিল ও। সম্রাট ওকে জোর করে লুডো খেলতে বসিয়েছিল, কিন্তু সারিকার খেলার দিকে মন ছিল না।

'কী হচ্ছে, দিদি! তোমার পাঞ্জা পড়েছে—ছক্কা পাঞ্জা নয়! ঠিক করে দান দাও!' সম্রাট অনুযোগ করে বলল।

এমন সময় পিসিমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন : 'কী রে, তুই কোথায় বেরিয়েছিলি?'

'একটু জারিনের সঙ্গে গল্প করতে গিয়েছিলাম—।'

সারিকা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না পিসিমাদের সবকিছু বলবে কি না। কিন্তু কাল তো পুলিশ আসবে! তখন জানাজানি তো হবেই! পিসেমশাই যেরকম ভিতু লোক—হয়তো চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়বেন! সারিকাকে হয়তো সাত-তাড়াতাড়ি দিল্লিতে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু নিশীথকে বিপদের মধ্যে ফেলে ও এখন দিল্লি যেতে চায় না।

চা খেতে-খেতে ও পিসিমাকে নিশীথের ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা বলল। বলল যে, ও আর জারিন ওপরে নিশীথের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। ব্যাপার-স্যাপার দেখে ওরা থানায় খবর দিয়েছে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মা, পিসিমা, পিসেমশাই আর সারিকা আলোচনায় বসল।

সারিকা বারবার করে সবাইকে বোঝাল যে, দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। সেরকম কোনও সমস্যা হলে ও কর্নেল বিক্রম সেনকে সব জানাবে। কর্নেলকাকু অতি সহজেই এসব সামাল দিতে পারবেন।

সারিকার পিসেমশাইয়ের কীরকম যেন ভাই হন কর্নেল বিক্রম সেন। বেশ কিছুদিন হল মিলিটারি থেকে রিটায়ার করেছেন। কলকাতায় বেড়াতে এসে

ওঁর সঙ্গে প্রথম আলাপেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সারিকা। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা রয়েছে কর্নেলের ঝুলিতে! ভদ্রলোক বিপত্নীক, নিঃসন্তান, আর ভীষণ স্নেহপ্রবণ। মাত্র কয়েকবার দেখা-সাক্ষাতেই সারিকাকে ঠিক যেন নিজের মেয়ের মতোই ভালোবেসে ফেলেছেন।

কর্নেল পঙ্গু। এখন সারাটা দিন হুইলচেয়ারে বসে কাটান। বাড়িতে আয়া, চাকর-বাকরের অভাব নেই। তা ছাড়া বন্ধু-বান্ধব নিয়ে রোজ সন্ধেবেলা নিজের ড্রইংরুমে তাসের আড্ডা বসান।

সারিকার এখন মনে হল, কর্নেলকাকুকে সব জানানো দরকার।

মা, পিসিমা, পিসেমশাই শুধু দুশ্চিন্তাই করতে পারবেন। তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না। কর্নেল সেনের অনেক যোগাযোগ আছে। তিনি হয়তো এ-রহস্যের জট ছাড়ানোয় সাহায্য করতে পারবেন।

কিন্তু হঠাৎই কেন যে সারিকার মন ঝুঁকে পড়ল নিশীথ সান্যালের দিকে!

এই সহজ কথাটা নিশীথ নিরুদ্দেশ হওয়ার আগেও কেউ যদি সারিকাকে বলত—তা হলে ও হয়তো খুব একটা পাত্তা দিত না। কিন্তু এই মুহূর্তে ও নিশীথের সঙ্গে বন্ধুত্বের অন্যরকম অর্থ যেন খুঁজে পাচ্ছিল। নিশীথের কথা ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল ও।

স্বপ্নে দেখল, হাতে উল্কি আঁকা সেই আগন্তুক যেন ওর দিকে এগিয়ে আসছে। তার হিংস্র হাসি, হাতের দীর্ঘ জান্তব নখ, বাঁকানো আঙুল—সব মিলিয়ে সে এক বীভৎস দৃশ্য।

আতঙ্কে ঘুম ভেঙে গেল সারিকার। হাতের উলটোপিঠ দিয়ে গলার ঘাম মুছতে গিয়েই হাত ঠেকল লকেটটায়।

এতক্ষণ এটার কথা খেয়ালই ছিল না ওর। মা-পিসিমাকে ও লকেটটা পরে দেখিয়েছে। পাথরটা দেখে ওঁরা কেউই ওটার দাম বিশ্বাস করতে পারেননি। সারিকারও কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল।

সারিকা ভেবে দেখল, যে-মুহূর্ত থেকে এই হারটা ও কিনেছে, সেই মুহূর্ত থেকেই সব অস্বাভাবিক ঘটনার শুরু। ও ঠিক করল আজ সন্ধেবেলা কর্নেল সেনের বাড়িতে যাবে। তাঁর কাছে এ-ব্যাপারে সাহায্য চাইবে। জানতে চাইবে—এক্ষেত্রে ওর কী করা উচিত।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সারিকা। এগিয়ে গেল ড্রইংরুমের টেলিফোনের দিকে। ফোন তুলে ডায়াল করল কর্নেল সেনের নম্বর।

একটু পরেই ও-প্রান্তে রিসিভার তোলার শব্দ হল।

'কর্নেল সেন স্পিকিং—।'

'আমি—আমি সারিকা।'

'ও—কী খবর বল? রণেন কেমন আছে?'

'ভালো—।' রণেন সারিকার পিসেমশাইয়ের নাম।

'হঠাই যে ফোন করলি!' বয়স হলেও বিক্রম সেনের গলা থেকে গাঢ় সবুজ আত্মীয়তার স্বরটি কিন্তু মিলিয়ে যায়নি।

'আজ সন্ধেবেলা তুমি ঘরে থাকছ তো?' সারিকা ফোনে পাথরের ব্যাপারটা জানাতে চাইল না।

'ঘরে থাকব না তো যাব কোথায়!' ও-প্রান্তে হাসির শব্দ হল : 'ভগবান কি আর সে ক্ষমতা রেখেছে! তুই সন্ধেবেলা আয়, চুটিয়ে তাস খেলা যাবে। আরও দু-একজন আসবেন—তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে তোর ভালো লাগবে। চলে আয়।'

'আচ্ছা—তা হলে সন্ধে সাতটা নাগাদ যাব। তোমার সঙ্গে দেখা করাটা ভীষণ দরকার।'

কর্নেল সেন অবাক হয়ে কিছু বলে ওঠার আগেই রিসিভার নামিয়ে রেখেছে সারিকা।

কর্নেল সেনের বাড়িতে পৌঁছনো পর্যন্ত নিশীথ আর সেই অদ্ভুত আগন্তুকের চিন্তায় সারিকার মন ডুবে রইল।

কলিংবেল টিপতেই সবসময়ের আয়া মেরিয়ন দরজা খুলে দিল। তারপর সারিকাকে দেখেই একগাল হেসে অভ্যর্থনা জানাল। বলল, 'কর্নেল সেন আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আসুন।'

মেরিয়ন বাঙালি খ্রিস্টান। এতদিনকার আলাপ-পরিচয়ে সারিকা বুঝেছে, ও ভীষণ ধর্মভীরু। কর্নেল সেনের তত্ত্বাবধানের ভার মেরিয়নের ওপরে। বয়েস হয়েছে ওর, কিন্তু নানান আকর্ষণ এখনও ভোঁতা হয়ে যায়নি।

ড্রইংরুমে পা রাখতেই সারিকা অবাক হল। ঘরে খুব অল্প পাওয়ারের একটা নীল আলো জ্বলছে। ঘরের দূর-প্রান্তে, বুক-শেল্‌ফের পাশে, হুইলচেয়ারে বসা একটা ছায়ামূর্তি। তার হাতে জলন্ত সিগারেট।

সারিকা ঢুকতেই ছায়ামূর্তি সরব হল, 'কে, সারি এসেছিস? আয়, বোস।'

কর্নেল বিক্রম সেন।

'ঘরের আলো নেভানো কেন, কাকু?'

'এমনিই। তা ভীষণ দরকার বলছিলি—ব্যাপারটা কী?'

সারিকা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার মেরিয়নের দিকে তাকাল। সঙ্গে-সঙ্গেই বিক্রম সেনের ভরাট স্বর শোনা গেল, 'মেরিয়ন, বড় আলোটা জ্বেলে দিয়ে তুমি

একটু ও-ঘরে যাও।'

মেরিয়ন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই সারিকা একটা চেয়ার টেনে কর্নেল সেনের কাছে বসল। পাথরের হার কেনা থেকে শুরু করে নিশীথের নিরুদ্দেশ হওয়া পর্যন্ত সব ঘটনা এক নিশ্বাসে বলে গেল। সবশেষে প্রশ্ন করল, 'এখন আমার কী করা উচিত বলো। সেটা জানতেই তোমার কাছে এসেছি—।'

সারিকার শেষ কথাগুলো কর্নেল সেনের কানেও ঢোকেনি। তিনি তখন অবাক চোখে চেয়ে আছেন সারিকার গলায় ঝোলানো পাথরের লাল লকেটটার দিকে। তাঁর মুখ দিয়ে প্রশংসার একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল : 'অপূর্ব!'

ঘরের আলো ঠিকরে পড়ছে রক্ত-লাল চুনিটার গা থেকে। ঠাণ্ডা আগুনের মতো ধকধক করে জ্বলছে পাথরটা।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের দরজা খুলে গেল। একটা তরল স্বর ভেসে এল দরজার কাছ থেকে, 'কী অপূর্ব, সেনসাহেব?'

মুখ তুলে তাকালেন বিক্রম সেন। দেখলেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জনৈক দীর্ঘকায় পুরুষ।

হাত বাড়িয়ে তাঁকে আহ্বান জানালেন কর্নেল : এসো, কাপুর—এসো।'

কাপুর ঘরে ঢুকতেই তাঁর প্রশ্নের জবাব দিলেন কর্নেল সেন, 'অপূর্ব এই পাথরটা।' ঘরের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করতে লাগল চুনিটা।

কৌতূহলী হয়ে সারিকা চোখ ফেরাল আগন্তুকের দিকে। দীর্ঘকায় সুদর্শন চেহারা। চোখজোড়া অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। মাথায় ব্যাকব্রাশ করা কালো চুল।

সারিকার উৎসুক দৃষ্টিকে অনুসরণ করে হাসলেন কর্নেল সেন : 'সারি—ইনি আমার বন্ধু—প্রতিদিনকার তাস খেলার সাথী আনন্দ কাপুর।...কাপুর, এ আমার ভাইয়ের ক্লোজ রিলেটিভ। দিল্লিতে পড়াশোনা করেছে। এখন ছুটিতে মাসখানেকের জন্যে মাকে নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে এসেছে। সারিকা মুখার্জি।'

সারিকার নমস্কারের উত্তরে আনন্দ কাপুর প্রতি-নমস্কার জানালেন। বললেন, 'ওই পাথরটার ব্যাপারে আমি কিন্তু কর্নেল সেনের সঙ্গে একমত, মিস মুখার্জি। সত্যিই অসাধারণ।'

'কিন্তু পাথরটা নকল।' সারিকা সহজভাবে কথাটা বললেও ভীষণভাবে চমকে উঠলেন আনন্দ কাপুর।

'মাই গুডনেস! ইট্‌স জাস্ট ইম্‌পসিবল!' সারিকার দিকে এগিয়ে এসে তিনি কাছ থেকে ওর গলায় ঝোলানো পাথরটা ভালো করে দেখলেন : 'অসম্ভব! এটা যদি ঝুটো পাথর হয়, তাহলে আমার জুতোজোড়াও সোনার তৈরি!'

সারিকা হতবাক। ওর বিস্ময়ের ভাবটা মুখ থেকে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই কর্নেল সেন গম্ভীর গলায় বললেন, 'সারি, কাপুর ইজ রাইট। পাথরটা আসল,

যেমন আসল আমার আঙুলের এই চুনিটা।' বলে নিজের ডান হাতের অনামিকাটা সারিকার সামনে বাড়িয়ে ধরলেন কর্নেল সেন। তাঁর অনামিকায় জ্বলজ্বল করছে একটা ছোট চুনি।

'কিন্তু—কিন্তু কী করে এই হারটা ওই দোকানের শো-কেসে গেল?' সারিকার প্রশ্ন।

'বলা কঠিন।' চিন্তিত মুখে জবাব দিলেন বিক্রম সেন, 'তুই তো বলছিলি রাস্তায় কেউ তোকে ফলো করছিল। সে হয়তো এই পাথরটার জন্যেই। এটার দাম হবে কম করেও পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা।'

সারিকা এবার সম্পূর্ণ নতুন আলোয় সমস্ত ঘটনা ভাবতে শুরু করল।

একটা ঝুটো পাথরের দোকানে এই মহামূল্য চুনিটা গেল কেমন করে! বাদশায় দেখা ওই লোকটাই বা কে? নিশীথের নিরুদ্দেশ হওয়ার পিছনে এই চুনির কি কোনও ভূমিকা আছে?

ভাবতে-ভাবতে তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল ও। ওর মনে পড়ল, বাদশায় নিশীথ যখন হারের বাক্সটা টেবিলে রেখে ট্যাক্সি ডাকতে যায়, তখন বাক্স থেকে হারটা বের করে সারিকা গলায় পরেছিল। ওর গায়ে ফারের কোট থাকায় চুনিটা লোমের কলারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। নিশীথ আবার ফিরে এসে হারের বাক্সটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পকেটে ভরে। হয়তো ও তখনও ভেবেছে হারটা বাক্সের ভেতরই আছে। তারপর সারিকাকে ফেলে রেখে নিশীথ বাক্স নিয়ে সরে পড়ে।

তা হলে কি নিশীথ জানত, চুনিটা নকল নয়, আসল। নিশ্চয়ই জানত। নইলে ওরকমভাবে সারিকাকে ফেলে চুনিটা নিয়ে কেন সরে পড়ার চেষ্টা করবে! কিন্তু নিশীথের এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কী? কেউ কি তখন নিশীথকে বাক্সটা নিয়ে পকেটে রাখতে দেখেছিল? তারপর সে-ই হয়তো নিশীথকে ফলো করেছে—আবিষ্কার করেছে বাক্সটা খালি। তাই হয়তো গত রাতে এসেছিল নিশীথের ফ্ল্যাটে।

ভাবতে-ভাবতে সারিকার সব কিছু গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। ও গলা থেকে হারটা খুলে নিয়ে নতুন করে চুনিটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

আশ্চর্য! এই পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা দামের পাথরটাকে অবহেলাভরে সঙ্গে নিয়ে ও যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে!

হঠাৎই আনন্দ কাপুরের কথায় সারিকার ঘোর কাটল : 'মিস মুখার্জি, আপনি যদি পারমিশান দেন তা হলে এই পাথরটার একটা ভ্যালুয়েশন করিয়ে আনতে পারি। আমার চেনাশোনা একজন জুয়েলার আছে—।'

'তার কোনও দরকার নেই, কাপুর।' বাধা দিলেন কর্নেল সেন, 'সারি তো

আর ওটা বেচতে যাচ্ছে না! তবে এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে, পাথরটার দাম অনেক—সাধারণের কল্পনার বাইরে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, কর্নেল, পাথরটা জেনুইন।'

মেরিয়নের স্বরে ভীষণভাবে চমকে উঠলেন কর্নেল সেন। ও যে কখন তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তিনি টেরই পাননি।

একটু বিরক্ত হয়েই হুইলচেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে মেরিয়নের মুখোমুখি হলেন তিনি।

'তোমাকে এ-ঘরে আসতে কে বলেছে?' রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করলেন কর্নেল।

'না—মানে—আপনি অনেকক্ষণ একা রয়েছেন...তাই ভাবলাম যদি কোনও দরকার হয়—।'

'শাট আপ—' গর্জে উঠলেন কর্নেল সেন, 'ঢের হয়েছে, আর এক্সপ্লেইন করতে হবে না। তোমাকে মেজর চৌধুরী আয়া হিসেবেই দিয়েছেন, বডিগার্ড হিসেবে নয়।'

মেরিয়নের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। ও মাথা নিচু করল।

এই জটিল মুহূর্তে হঠাৎই শোনা গেল কারও দরাজ কণ্ঠস্বর, 'আরে, কাপুর পৌঁছে গেছে দেখছি! কিন্তু ব্যাপার কী, বিক্রম, তোমাকে দেখে বেশ বিরক্ত মনে হচ্ছে! মেরিয়ন কিছু করেছে নাকি?'

আগন্তুক কথা বলতে-বলতে খোলা দরজা ছেড়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, কপালে বলিরেখা, চোখে-মুখে অভিজ্ঞতার ছাপ। ঠোঁটের কোণে সব সময়েই একটুকরো হাসি।

'এসো, নীরেন।' গভীর স্বরে আহ্বান জানালেন কর্নেল সেন, 'আজ একটা ইন্টারেস্টিং কাহিনী তোমাকে শোনাব।' তারপর সারিকার দিকে ফিরে বললেন, 'আমার আর-এক বন্ধু—নীরেন বর্মা।'

উপস্থিত প্রত্যেকের মুখে একপলক চোখ বুলিয়ে নিল আগন্তুক। তারপর মেরিয়নের দিকে ঘুরে বলে উঠল, 'ইফ য়্যু ডোন্ট মাইন্ড, মেরিয়ন—এক গ্লাস জল।'

নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মেরিয়ন।

ও চলে যেতেই মুখ খুললেন বিক্রম সেন। সারিকার পরিচয় দিয়ে বললেন ঝুটো পাথরের দোকান থেকে ওর আসল চুনি বসানো হার কেনার কথা।

কর্নেলের কথা শুনে ভীষণ কৌতূহলী হয়ে পড়লেন নীরেন বর্মা। বললেন, 'মিস মুখার্জি, পাথরটা একবার দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' গলা থেকে হারটা খুলে নীরেন বর্মার হাতে তুলে দিল সারিকা।

সেটাকে বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। আপনমনেই বলে উঠলেন, 'হুঁ—দাম হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি তিরিশ হাজার টাকা। কিন্তু আশ্চর্য! এই পাথরটা নিউ মার্কেটের দোকানে গেল কী করে! ডক্টর কাপুর, আপনার কী ধারণা?'

সারিকা অবাক হয়ে আনন্দ কাপুরের দিকে তাকাতেই তিনি হাসলেন : 'মানুষের ডাক্তার নই : ইতিহাসে ডাক্তার। আমি জয়পুরিয়া কলেজের জনৈক প্রফেসর—এবং নিঃসন্দেহে ছাত্রদের কৃপার পাত্র।'

সারিকা তাঁর কথা বলার ভঙ্গিতে না হেসে পারল না। সেই হাসিতে সকলে যোগ দিলেন।

'আপনার জল।' মেরিয়নের দৃষ্টি নীরেন বর্মার হাতের পাথরটার দিকে।

'থ্যাংক য়্যু,' গেলাসটা নিয়ে ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিলেন নীরেন বর্মা। গ্লাসটা রাখলেন সামনের টেবিলের ওপর। তারপর পাথরটা বিক্রম সেনের হাতে দিলেন: 'বিক্রম, লক্ষ করো, পাথরটা কাটা হয়নি। অর্থাৎ, একটা বিশেষ কোনও কারণে এটাকে কাটা হয়নি। তা ছাড়া কারও পক্ষে এটাকে চুরি করাও মিনিংলেস। কারণ, এ-পাথর বিক্রি করাটা নেহাত সহজ হবে না। ব্যাপারটা পুলিশের নজরে পড়বেই।'

'আমার মনে হয় এটা পুলিশের হাতেই তুলে দেওয়া ভালো।'

'না, না—ভুলেও ও-কাজ করবেন না।' কর্নেল সেনকে বাধা দিলেন আনন্দ কাপুর, 'ওরা ভাববে এ-ব্যাপারে আপনারাই দোষী। পাথরটা হজম করতে না পেরে পুলিশে ফেরত দিচ্ছেন।'

'আমার কাছে হিস্টোরিক্যাল ভ্যালু আছে এমন সব মণিমুক্তো পাথরের একটা ক্যাটালগ আছে। আমি বরং দেখতে পারি পাথরটা সেরকম কোনও দরের পাথর কি না। হয়তো ঘটনাচক্রেই কলকাতায় এসে পড়েছে—ঠিক কোহিনূরের মতো।' বলে সারিকার দিকে ফিরলেন নীরেন বর্মা : 'মিস মুখার্জি, আমার একটা কিউরিয়ো শপ আছে। তা ছাড়া আমার বাড়িতে একটা ছোট ল্যাবরেটরিও আছে। যদি পারমিশান দেন, তা হলে আমি পাথরটার ওপর দিনদুয়েক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে আপনাকে তার রেজাল্ট জানাতে পারি।'

সারিকা ইতস্তত করছে দেখে কর্নেল সেন ওকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন: 'না, বর্মা, তাতে লাভ কিছু হবে বলে আমার মনে হয় না। তার চেয়ে আমার মনে হয়, পুলিশে জমা দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'স্যার, আমি একবার দেখব—' ঘাড় ফেরাতেই বিব্রত মেরিয়নের চোখে চোখ পড়ল কর্নেল সেনের। কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন, 'নাও, দ্যাখো।'

'সারি—' এবার সারিকাকে লক্ষ করে তিনি বললেন, 'নিশীথ সান্যাল ফিরে এলে আমাকে একটা খবর দিস। আগে থেকেই মন খারাপ করিস না। হয়তো কোনও রিলেটিভের বাড়িতে গিয়ে বসে রয়েছে।'

'মিস মুখার্জি, আশা করি পাথরটার একটা ছবি তুলতে চাইলে আপনার কোনও আপত্তি থাকবে না?' আনন্দ কাপুর জিগ্যেস করলেন।

'না, না, আপত্তির কী আছে!'

নীরেন বর্মা এবার প্রস্তাব দিলেন : 'বিক্রম, আর দেরি করে লাভ কী। নাও, তাসের প্যাকেট বের করো।'

বিক্রম সেন 'করছি' বলে ফিরলেন মেরিয়নের দিকে : 'মেরিয়ন, দেখি, হারটা দাও।'

'আমি তো ওটা ডক্টর কাপুরের হাতে দিলাম।' মেরিয়ন যেন বিস্মিত।

'আমি ওটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখেছি।' সহজ স্বরে জবাব দিলেন কাপুর।

'হ্যাঁ, আমি আপনাকে টেবিলে নামিয়ে রাখতে দেখেছি।' সারিকা গম্ভীর গলায় বলল, 'তবে ব্যাপারটা কী জানেন, চুনিটা সেখানে আর নেই।'

সত্যিই, চুনি বসানো হারটা আর কোথাও নজরে পড়ছে না। যেন চোখের পলকে পাথরটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!

॥ পাঁচ ॥

'নিশ্চয়ই টেবিল থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেছে।' আনন্দ কাপুর যেন সম্ভাবনাটা সম্পর্কে প্রায়-নিশ্চিত।

অতএব সারিকা, নীরেন বর্মা, মেরিয়ন এবং ডক্টর কাপুর—চারজনেই উবু হয়ে বসে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন।

কিন্তু বহুক্ষণ পরিশ্রমের পরও চুনিটা পাওয়া গেল না।

অনুসন্ধান-পর্ব শেষ করে ওঁরা চারজনেই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। সকলেই চুপ।

মিনিটপাঁচেক কেটে গেল নীরবতায়।

অবশেষে কথা বললেন কর্নেল সেন, 'মেরিয়ন, সদর দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

মেরিয়ন যন্ত্রের মতো এগিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

'আমাকে এই মুহূর্তে যে-কথাগুলো বলতে হবে, তা বলতে হচ্ছে বলে আমি আন্তরিক দুঃখিত।' শান্ত স্বরে বলে চললেন কর্নেল সেন, 'আমার ধারণা, একটা কঠিন জড় পদার্থ কখনওই জ্যান্ত হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। এর জন্যে আমাদের পাঁচজনের একজনই দায়ী। জানি না, এটা কেউ অন্যমনস্কভাবে তুলে নিয়েছে কি না, তবে একটা সুযোগ আমি তাকে দিতে চাই। আমরা এখন সেই পুরনো টেকনিকই ব্যবহার করব। আশা করি, সেই চান্সটা যে নেওয়ার সে নেবে।'

'তার মানে!' আনন্দ কাপুরের ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে পড়ছে।

'তার মানে এই ঘরের আলো দু-মিনিটের জন্যে নিভিয়ে দেওয়া হবে। চুনিটা যে-ই নিয়ে থাকুক, আশা করি, দু-মিনিট বাদে ঘরের আলো জ্বলে ওঠার পর চুনি বসানো হারটাকে আমরা আবার টেবিলের ওপরেই দেখতে পাব। অতএব....মেরিয়ন, ঘরের আলোগুলো সব নিভিয়ে দাও।'

সেই একই যান্ত্রিক ভঙ্গিতে দরজার পাশে বসানো আলোর সুইচের দিকে এগিয়ে গেল মেরিয়ন। সুইচ অফ করে দিল।

মুহূর্তে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঘর ভরে গেল।

কান খাড়া করে প্রতীক্ষা করে রইল সারিকা। কিন্তু কই, কোনও শব্দই তো ওর কানে আসছে না! শুধু শোনা যাচ্ছে সকলের ভারি শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ।

নিজের রেডিয়াম ডায়াল হাতঘড়িতে চোখ রেখে অপেক্ষা করছিলেন বিক্রম সেন। দু-মিনিট সময় পার হতেই তিনি স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'মেরিয়ন, আলো জ্বেলে দাও।'

খুট করে সুইচ অন করার শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের আলো জ্বলে উঠল। সকলেই চোখ ফেরালেন টেবিলের দিকে।

না, চুনিটা তখনও অদৃশ্যই থেকে গেছে।

'কাপুর, নীরেন—তোমরা আশা করি আমার পজিশনটা বুঝতে পারছ।' আনন্দ কাপুর ও নীরেন বর্মার মুখের ওপর দিয়ে নজর বুলিয়ে নিলেন কর্নেল সেন : 'সুতরাং, তোমরাই বলো, আমার নেক্সট স্টেপ কী হওয়া উচিত।'

একটু আমতা-আমতা করে বলেই ফেললেন নীরেন বর্মা, 'নিজেদের সার্চ করা ছাড়া আমি তো আর কোনও উপায় দেখছি না।'

'নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে হলে সেটাই তো একমাত্র পথ।' সমর্থন জানালেন আনন্দ কাপুর।

'তা হলে তাই হোক। সারি—' সারিকার দিকে ফিরলেন কর্নেল সেন : 'তুই আর মেরিয়ন একটু পাশের ঘরে যা। আশা করি দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের সার্চ করার কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

সারিকা কোনও কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। পা বাড়াল পাশের ঘরের দিকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেরিয়ন ওকে অনুসরণ করল।

ওরা দুজনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই বিক্রম সেন বললেন, 'কাপুর, তুমি আর নীরেন এ-ওকে সার্চ করার কাজটা আগে সেরে নাও। আমি নজর রাখছি। তারপর তোমাদের হয়ে গেলে, তুমি অথবা নীরেন, যে-কেউ আমাকে সার্চ করতে পারো।'

'ডোন্ট টক রট!' বিক্রম সেনকে ধমক দিলেন নীরেন বর্মা : 'তোমাকে আমরা সার্চ করতে যাব কোন দুঃখে! আর ওই চুনিটা নিয়েই বা তুমি কী করবে! তোমার কাছে মণিমুক্তো কি নেহাত কম আছে?'

'বর্মা ঠিকই বলছে, বিক্রম।' আনন্দ কাপুর বললেন।

'তা হোক। তবুও আমি চাই আমাকেও সার্চ করা হোক।' নিজের বক্তব্যে বিক্রম সেন অবিচল।

অতএব তাঁর কথামতোই কাজ হল। বিক্রম সেনের চোখের সামনেই পরস্পরকে তন্নতন্ন করে সার্চ করলেন আনন্দ কাপুর ও নীরেন বর্মা। এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই অনুসন্ধানের ফলাফল হল শূন্য।

তারপর ওঁরা দুজনে এগিয়ে এসে কর্নেল সেনকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। দ্রুত হাত চালিয়ে তাঁর শরীর অনুসন্ধান করলেন নীরেন বর্মা। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

কর্নেল বিক্রম সেন এবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন : 'নীরেন, ও-ঘর থেকে সারিকা আর মেরিয়নকে ডেকে পাঠাও।'

নীরেন বর্মা চটপট ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

'সেন,' নীরবতা ভাঙলেন ডক্টর কাপুর, 'জানি, আমার বলা উচিত নয়, কিন্তু বর্মার যে একটা কিউরিয়ো শপ আছে এ-কথাটা তুমি একেবারে ভুলে যেয়ো না।'

বিক্রম সেন হাসলেন : 'আমার মনে হয় পাথরটা টেবিল থেকে গড়িয়ে কোথাও পড়ে গেছে। কাল সকালেই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে।'

এমন সময় মেরিয়ন, সারিকা, আর নীরেন বর্মা একসঙ্গে এসে ঘরে ঢুকল।

কর্নেল সেনের কাছে এসে থামল সারিকা : 'কাকু, ও-ঘরে গিয়ে আমি আর মেরিয়ন এ-ওর পোশাক তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি—পাথরটা কোথাও নেই।'

'তার কোনও প্রয়োজন ছিল না।'

'কেন নয়?' কর্নেল সেনকে উদ্দেশ করে বলে উঠল মেরিয়ন, 'এ-ধরনের দামী কোনও জিনিস চুরি গেলে সন্দেহটা স্বাভাবিকভাবেই বাড়ির কাজের

লোকদের ওপর আসে, তাই না? মুখে কিছু না বললেও, আপনাদের মনে হয়তো একটা সন্দেহ থেকেই যাবে। ভাববেন হয়তো আমিই...। আর, এই খবরটা শোনার পর মেজর চৌধুরী হয়তো আমাকে আর কোথাও পার্সোনাল নার্স হিসেবে রেকমেন্ড করবেন না—!'

'মেরিয়নের কথায় যুক্তি আছে।' সারিকা সমর্থন জানাল, 'সেইজন্যেই আমি ওর প্রোপোজালে রাজি হয়ে ওকে সার্চ করেছি।'

'তা হলে মোদ্দা ব্যাপারটা হল, চুনিটা আমাদের পাঁচজনের কারও কাছেই নেই।' সিদ্ধান্তটা স্পষ্ট করেই উচ্চারণ করলেন কর্নেল সেন, 'কাপুর, বর্মা—আমি দুঃখিত যে, আজ তাসের আসর বসানোর মতো মেন্টালিটি আমাদের কারও নেই। অতএব, গুড নাইট। ...সারিকা—,' সারিকার দিকে চোখ ফেরালেন কর্নেল, 'তুই পরশু সকালে একবার আমার সঙ্গে দেখা করিস—কথা আছে।'

এবার হুইলচেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে পাশের ঘরের দিকে এগোলেন বিক্রম সেন। শুধু একবার মেরিয়নের দিকে ঘাড় ফেরালেন : 'মেরিয়ন, আমার খাবার দেওয়ার সময় হয়েছে।'

কর্নেল সেন ঘর ছেড়ে বেরোতেই আনন্দ কাপুর বললেন, 'মিস মুখার্জি, যদি আপত্তি না করেন তো আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।'

কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল সারিকা। সম্ভবত সেই মর্স কোডের বিচিত্র ছন্দটার কথা, তারপর রাজি হল।

সুতরাং ওরা তিনজনেই বিক্রম সেনের বাড়ি ছেড়ে সতীশ মুখার্জি রোডে বেরিয়ে এলেন।

রাস্তা নির্জন। নীরেন বর্মা মৃদু স্বরে বিদায় নিয়ে হনহন করে পা চালালেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউর দিকে। সারিকা ও আনন্দ কাপুর বড় রাস্তার দিকে পা বাড়াল—ট্যাক্সির খোঁজে।

পথে যেতে-যেতে নিশীথ আর অনুসরণের ব্যাপারটা কাপুরকে জানাল সারিকা।

সব শুনে তিনি একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। পরে বললেন, 'মিস মুখার্জি, আপনি তো শুনলেন, নীরেন বর্মার একটা কিউরিয়ো শপ আছে। হয়তো চুনিটা আসল শোনার পর একটা নতুন কিউরিয়ো কালেকশানের লোভে ও নিজেকে আর সামলাতে পারেননি। আমি তো বাজি ফেলে বলতে পারি, ওই পাথরটা বর্মা ছাড়া আর কেউ নেয়নি।'

'কী জানি!' অনিশ্চিত স্বরে জবাব দিল সারিকা।

আনন্দ কাপুরের ট্যাক্সি সারিকাকে নামিয়ে দিল ল্যান্সডাউন রোডে। রাত

তখন পৌনে দশটা। রাস্তা নির্জন। সুতরাং একটু ভয় যে মনকে দোলা দিল না তা নয়। তাড়াতাড়ি পা চালাল সারিকা।

প্রথমটা ঠিক ঠাহর করতে পারেনি। কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পর বেশ স্পষ্টই সারিকার কানে এল শব্দটা : ঠক—তারপরই পা টেনে চলার একটা অদ্ভুত শব্দ, আবার ঠক—এবং একই পুনরাবৃত্তি। যেন মর্স কোডের সঙ্কেত।

ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সারিকা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল। কেউ নেই।

ভয়ে প্রায় ছুটতে শুরু করল সারিকা। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে-ছুটতে থামল এসে একবারে ওদের ফ্ল্যাটবাড়ির দরজায়। পিছনে অনুসরণের শব্দ তখন ফিকে হয়ে সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে এলিভেটরে উঠল সারিকা। দারোয়ান বা কাউকেই কাছাকাছি নজরে পড়ল না। বোতাম টিপতেই যন্ত্রযান নিঃশব্দে উঠতে শুরু করল। সেই সঙ্গে সারিকার বুকের ঢিপঢিপ শব্দও বেড়ে চলল।

হঠাৎই থেমে গেল লিফট। দরজা খুলে গেল। সামনেই সারিকার পিসিমাদের ফ্ল্যাটের করিডর। করিডরের আলোটা নেভানো।

আশ্চর্য! কে নেভালো আলোটা!

লিফট ছেড়ে বাইরে আসতেই সারিকা লক্ষ করল জারিনের ফ্ল্যাটে কোনও আলো জ্বলছে না। তা হলে ও হয়তো কোথাও বেরিয়েছে।

অন্ধকারেই দেওয়ালে হাত রেখে নিজেদের দরজার কাছে এগিয়ে চলল ও।

কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে গেল। কিন্তু ঘরের ভেতরটা অন্ধকার থাকায় কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছিল না।

কিন্তু কে দরজা খুলল!

মা-পিসিমা ওরা সব কোথায়?

আবছা আলো-আঁধারে সারিকার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। একইসঙ্গে অবাকও হল।

আন্দাজে ধীরে-ধীরে আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়াল।

ঠিক তখনই একটা জ্বলন্ত অগ্নিবিন্দু ওর নজরে পড়ল। আর একটা গাঢ় ছায়া কোথা থেকে যেন ওর সামনে এসে দাঁড়াল। এক ধাক্কায় দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ে কানফাটানো চিৎকার করে উঠল সারিকা। ওর চিৎকারে গোটা ফ্ল্যাটটা যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। কিন্তু সেই আর্তনাদের রেশ শেষ হওয়ার আগেই একটা লোমশ বলিষ্ঠ কালো থাবা এসে পড়ল সারিকার মুখে—মাঝপথেই থামিয়ে দিল ওর চিৎকার। একটা ভরাট কণ্ঠস্বর আচ্ছন্ন

সারিকার কানে আছড়ে পড়ল, 'এতক্ষণ ধরে আপনার অপেক্ষাই করছিলাম, মিস মুখার্জি।'

॥ ছয় ॥

একটু পরেই ঘরের আলো জ্বলে উঠল। আগন্তুক তার হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা মেঝেতে ফেলল, পায়ের চাপে নিভিয়ে দিল আগুন।

সারিকা এবার তাকে স্পষ্ট চিনতে পারল।

বাদশার সেই বিচিত্র আগন্তুক।

'একটা বিশেষ দরকারে আমি আপনার কাছে এসেছি, মিস মুখার্জি। আপনার কোনও ভয় নেই।' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গুছিয়ে বসল লোকটি : 'আপনার কাছে যে-লাল পাথরটা আছে, ওটা আমি ফেরত চাই।'

সারিকা ওর হতবুদ্ধি আতঙ্কের ভাবটা ততক্ষণে কাটিয়ে উঠেছে। ও জানতে চাইল : 'আমার মা-পিসিমা সব কোথায়?'

আগন্তুক শান্ত গলায় বলল, 'আপনার রিলেটিভরা সবাই ভেতরের ঘরে আছেন। আমি ওঁদের সবাইকে ও-ঘরে আটকে রেখেছি। বলেছি, ভয়ের কিছু নেই। মিস মুখার্জির সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা বলেই আমি চলে যাব। অনেস্টলি বলছি, মিস মুখার্জি—মিনিট পনেরো-কুড়ির বেশি সময় আমি নেব না। আর কথাগুলো সত্যিই খুব জরুরি...।'

'আমি মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করব।' সারিকা অনুনয়ের গলায় বলল।

'শুধু-শুধু কমপ্লিকেশান বাড়াবেন না। আমি চাই না, যেসব কথা আমি বলব সেগুলো বেশি লোকজানাজানি হোক। তাতে আপনার বিপদ আরও বাড়বে। আপনাকে সব খুলে বললেই আপনি ক্লিয়ারলি সব বুঝতে পারবেন। আপনি আমাকে জাস্ট পনেরো মিনিট সময় দিন...প্লিজ...আপনার কোনও ভয় নেই...।'

সারিকা বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ওর সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আগন্তুক বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন!'

'কিন্তু—কিন্তু আপনি আমাদের ফ্ল্যাটে ঢুকলেন কী করে? কী চান আপনি?' সারিকা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। ও সামান্য হাঁফাচ্ছিল।

'সব বলছি—তার আগে চুনিটা আমাকে ফেরত দিন।' সামনের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে ধরল আগন্তুক।

সারিকার স্পষ্ট নজরে পড়ল বেড়ালের নিখুঁত ছবিটা।

ও শিউরে উঠল, বলল, 'ওটা আর আমার কাছে নেই। আজ সন্ধেবেলা একজনের বাড়িতে আমরা কয়েকজন আড্ডা মারছিলাম। তখন পাথরটা হারিয়ে গেছে—।'

'মিথ্যে কথা!' চট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল আগন্তুক, 'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন—।'

'বিশ্বাস না হয় আপনি এই ফোন নাম্বারে ফোন করে জিগ্যেস করতে পারেন।' ব্যাগ থেকে পেন বের করে খসখস করে কর্নেল সেনের ফোন নম্বরটা লিখে দিল সারিকা।

কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল আগন্তুক। তারপর বলল, 'না, আপনি সত্যি কথাই বলছেন। তবে ওই চুনির সঙ্গে রিলেটেড পুরো ঘটনাটা আপনার জানা দরকার—তা হলে আপনি সিচুয়েশানটা বুঝতে পারবেন। তা ছাড়া ওই বহ্নিশিখার জন্যে আপনি বিপদে পড়ুন তা আমি চাই না।'

'বহ্নিশিখা!' সারিকা অবাক হল।

'হ্যাঁ, ওই চুনিটার নামই বহ্নিশিখা। সে এক লম্বা ইতিহাস।' একটা সিগারেট ধরাল আগন্তুক, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমার নাম প্রেমনাথ ধর, আমি কাশ্মীর থেকে এসেছি কলকাতায়—শুধু ওই বহ্নিশিখাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

'নিশীথ কোথায়?' সারিকা প্রশ্ন করল।

'আপনার সব প্রশ্নের উত্তরই পাবেন, মিস মুখার্জি। নিশীথ সান্যাল সম্পর্কে যতটুকু আমার জানা আছে—বলছি।' প্রেমনাথ ধর সিগারেটে এক গভীর টান দিল। মাথার কালো চুলে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল, 'রোহিত রায়কে আপনি চেনেন?'

অভিব্যক্তিহীন মুখে মাথা নাড়ল সারিকা।

'গত যুদ্ধের সময় ইন্ডিয়ান আর্মির রোহিত রায় আর সুখেন বর্মা কাশ্মীরে ছিল। যুদ্ধ চলার সময় কোনওরকম বিপদ দেখা দেয়নি। দেখা গেল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। রোহিত রায় আর সুখেন বর্মা এমনিই বেড়াতে বেড়াতে হরওয়ান জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছয়। ওই জায়গা থেকে মাইলদুয়েক দূরে একটা বিশাল মন্দির আছে—তখনও সেটা তৈরি হচ্ছিল। সেই মন্দিরের ভেতরে ভগবানের আসনে সাজানো ছিল বহ্নিশিখা। ওটা পাহারা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। আমরা—ভাবপ্রবণ হিন্দুরা—খুবই ধর্মভীরু লোক। তাই ওই পাথর চুরি করার কথা কেউ কখনও ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করিনি। অথচ রোহিত রায় লোভ সামলাতে পারেনি। সে একদিন চুপিসারে ওই চুনিটা তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। তখন হাতেনাতে ধরা পড়লে তার অবস্থা কী হত, সে একমাত্র

ভগবানই জানেন। কিন্তু ধরা সে পড়েনি!

'একটা ছোট প্লেনে করে পালানোর মতলব করেছিল রোহিত রায়। সুখেন বর্মা বরাবরই এই পাথর চুরিতে আপত্তি করেছিল, কিন্তু শেষে রোহিতের অনুরোধ-উপরোধে রাজি না হয়ে পারেনি। এরপর একটা নৃশংস দুর্ঘটনা ঘটল। এক সকালে আমরা দেখলাম সুখেন বর্মার ছিন্নভিন্ন দেহটা মাংসপিণ্ড হয়ে প্লেনের কাছে পড়ে রয়েছে। রোহিত জানাল, প্লেনের চলন্ত প্রপেলারে ধাক্কা লেগে সুখেনের ওই অবস্থা হয়েছে। দুর্ঘটনা। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়। চুনির লোভে সুখেন বর্মাকে খুন করেছিল রোহিত রায়। তখনও আমরা পাথর চুরির ব্যাপারে রোহিতকে সন্দেহ করে উঠতে পারিনি। সমস্ত ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার আগেই কাশ্মীর ছেড়ে সরে পড়ল রোহিত রায়। কিন্তু আমরাও অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নই। তাই আর্মিতে গোপনে খোঁজ করে আমরা রোহিতের ঠিকানা বের করলাম। তারপর থেকেই আমি ছায়ার মতো ওকে ফলো করতে লাগলাম।

'অবশেষে এলাম এই কলকাতায়। রোহিত শত চেষ্টাতেও চুনিটা তখনও পর্যন্ত বেচে উঠতে পারেনি। এদিকে এই পুকুরচুরির ব্যাপারটা ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরে জানাজানি হয়ে গেছে। তাই পুলিশের কর্তারা উঠে-পড়ে রোহিতের পেছনে লাগলেন।

'শুধু যে আমি এবং পুলিশ, তাই নয়। আরও একজন যুবককে আমি লক্ষ করেছি, রোহিতকে অনুসরণ করছে। কিন্তু রোহিত আমাদের কাউকেই ভয় পায়নি। ও ভয় পেত চার নম্বর কাউকে। সে কে বা কারা আমি কিছুই জানি না। শেষদিকে রোহিত পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। এমন করত যেন ওকে ভূতে তাড়া করে নিয়ে চলেছে। তারপর গতকাল সন্ধ্যায় একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল রোহিত। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, সুখেন বর্মার অ্যাক্সিডেন্ট আর রোহিত রায়ের অ্যাক্সিডেন্ট প্রায় এক টাইপের। তবে আমি জানি না, রোহিতকে কারা শেষ করেছে। একটা বড় শেভ্রলে গাড়ি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ওপর রোহিতকে চাপা দিয়ে চলে যায়।'

থামল প্রেমনাথ ধর। পোড়া সিগারেটের টুকরোটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে পিষে দিল।

প্রেমনাথ ধরের শেষ কথাটায় তড়িৎস্পৃষ্টের মতোই চমকে উঠল সারিকা। তা হলে কি পাথর বসানো হারটা কেনার পর ও আর নিশীথ যে-অ্যাক্সিডেন্টটা দেখেছিল তাতেই রোহিত রায় মারা গেছে!

প্রেমনাথ ধর যেন সারিকার মনের কথা বুঝতে পারল। বলল, 'হ্যাঁ, রোহিত যখন মারা যায়, তখন আপনি আর নিশীথ সান্যাল স্পটে ছিলেন। মারা যাওয়ার

আগে রোহিত হয়তো টের পেয়েছিল আজ আর তার রেহাই নেই। তাই সে পাথরটাকে নিউ মার্কেটের একটা দোকানে লুকিয়ে ফেলে। বয়ে বেড়ানোর সুবিধের জন্যে সে পাথরটা দিয়ে একটা বিছেহার বানিয়ে নিয়েছিল। যাই হোক, ঘটনাচক্রে সে-হার কিনে ফেললেন আপনি। অগত্যা রোহিতকে ছেড়ে আপনাকেই আমি ফলো করতে শুরু করলাম।

'আপনারা বাদশায় ঢুকলেন। আমিও ঢুকলাম। সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। নাটকীয়ভাবে আপনার সঙ্গে দেখাও করলাম। কিন্তু লাভ হল না। একটু পরেই আমার নজরে পড়ল মিস্টার সান্যাল চুনির বাক্সটা পকেটে ভরলেন, তারপর রেস্তঁরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। অতএব আমিও তাকেই ফলো করলাম। তিনি সোজা গিয়ে ঢুকলেন সামনের একটা ওষুধের দোকানে। কাকে যেন ফোন করলেন। আমি দূর থেকে লক্ষ করতে লাগলাম। একটু পরেই তিনি ফোন সেরে বেরিয়ে এলেন। আমি হাতসাফাই করে তাঁর পকেট থেকে চুনির বাক্সটা তুলে নিলাম।

'বাক্স নিয়ে আমি আর ওয়েট করিনি। সোজা রওনা হয়েছি আমার হোটেলের দিকে। কিন্তু কিছুদূর যেতেই দেখি মিস্টার সান্যাল পাগলের মতো পকেট হাতড়াচ্ছেন। তারপরই তিনি দৌড় লাগালেন ওষুধের দোকানটার দিকে। আমি হেসে আবার চলতে শুরু করলাম।

'কিন্তু ভাগ্যদেবীও সেই মুহূর্তে বোধহয় হেসেছিলেন। কারণ, হোটেলে গিয়ে বাক্স খুলে দেখি ফক্কিকার। কিচ্ছু নেই। তখন ভাবলাম, পাথরটা অন্য পকেটে সরিয়ে রেখে আমাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে মিস্টার সান্যাল অভিনয় করেননি তো! তাই রাত গভীর হতেই গেলাম নিশীথ সান্যালের ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাট চেনার জন্যে আমাকে বেশি কষ্ট করতে হয়নি। খোঁজখবর করার জন্যে বাদশায় আবার ফিরে গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই ওঁর নাম-ঠিকানা বের করে নিয়েছি—।'

'তা হলে কাল রাতে আপনিই নিশীথের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলেন?' প্রেমনাথ ধরকে বাধা দিয়ে জানতে চাইল সারিকা।

'হ্যাঁ, বহ্নিশিখার খোঁজে।' জবাব দিল সে, 'তবে কীভাবে ঢুকেছি তা জেনে আপনার লাভ নেই, যেমন লাভ নেই কীভাবে আপনাদের ঘরে ঢুকেছি তা জেনে। ...যাক, যে-কথা বলছিলাম। চুনির খোঁজ করতে গিয়ে আবারও আমি হতাশ হলাম। অবশেষে অনেক চিন্তার পর মনে হল, পাথরটা স্বাভাবিক ইমপাল্‌সে আপনি গলায় পরেননি তো! এ-কথা মনে হতেই আজ এখানে এসে আপনার জন্যেই এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছি। কিন্তু এখন দেখছি, সে সব বৃথাই।'

প্রেমনাথ ধরের স্বরে হতাশার সুর সারিকার কান এড়াল না। ও মনে-মনে কী যেন ভাবল। তারপর বলে বসল, 'আমার মনে হয়, আজ কর্নেল বিক্রম সেনের বাড়িতে কেউ ওটা চুরি করেছে।'

'কী!' ভীষণভাবে চমকে উঠল আগন্তুক, 'কী বললেন! চুরি করেছে!'

'হ্যাঁ।' সারিকার স্বর অবিচল।

'কে?'

'সম্ভবত আনন্দ কাপুর, অথবা নীরেন বর্মা।'

'ধন্যবাদ। যদি সত্যিই এঁদের কেউ বহ্নিশিখাকে হাতিয়ে থাকে, তা হলে আমার হাত এড়িয়ে তাঁরা বাঁচতে পারবেন না। চলি, মিস মুখার্জি। আপনাকে অসময়ে বিব্রত করার জন্যে মাপ করবেন।' বলে কোনওরকম সময় নষ্ট না করেই দরজার হাতল ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেল প্রেমনাথ ধর।

সে বেরিয়ে যেতেই দরজা বন্ধ করে দিল সারিকা। ছুটে গেল ভেতরের ঘরের দিকে।

দরজা খুলে দিতেই মা-পিসিমা-পিসেমশাই আর সম্রাটকে দেখতে পেল ও।

সম্রাট ছুটে এসে ওকে জাপটে ধরল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মা কাঁদতে-কাঁদতে সারিকার কাছে এসে দাঁড়াল : 'এসব কী শুরু হয়েছে, সারি! তুই শিগগিরই থানায় খবর দে। নইলে চল, আমরা দিল্লি ফিরে যাই—।'

সারিকা ঠিক কী বলবে বুঝতে পারছিল না। কারণ, বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মা সাহস আর আত্মবিশ্বাস অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। একবার কোনও ব্যাপার মাথায় ঢুকলে সকাল-বিকেল একই কথা বলে যাবে।

পিসেমশাই এবার কাছে এগিয়ে এলেন, ভয় পাওয়া গলায় বললেন, 'সারি, ব্যাপারটা কিন্তু সিরিয়াস। রাত ন'টার সময় কেউ আমাদের ফ্ল্যাটে ঢুকে রিভলবার উঁচিয়ে শাসাবে এটা কোনওদিন ভাবিনি...।'

হঠাৎই কী ভেবে সারিকা 'এক মিনিট—আসছি।' বলে ছুটে চলে গেল রাস্তার দিকের জানলার কাছে। পরদা সামান্য সরাতেই সে দেখল উলটোদিকের একটা বাড়ির বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে এক ছায়ামূর্তি। মাথায় কালো টুপি। পরনে গাঢ় রঙের পোশাক। চেহারাটা যেন খুব চেনা মনে হল সারিকার।

প্রেমনাথ ধর রাস্তায় পা দিয়ে চলতে শুরু করতেই শব্দটা শুনতে পেল। অতি সন্তর্পণে কেউ তাকে অনুসরণ করছে। গতি এবং যতি মিলিয়ে অনুসরণের ছন্দটা যেন মর্স কোডের ডট-ড্যাশেরই মতো। তাড়াতাড়ি পা চালাল প্রেমনাথ ধর।

সারিকা দেখল প্রেমনাথ ধর রাস্তায় পা দিতেই ছায়ামূর্তি নড়েচড়ে দাঁড়াল। তারপর একটু পরেই একান্ত অভ্যস্ত ভঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করল।

ঠিক তখনই আগন্তুককে চিনতে পারল সারিকা।

ডক্টর আনন্দ কাপুর!

॥ সাত ॥

পরদিন একটু বেলাতেই ঘুম ভাঙল সারিকার। মনে অনেক দুশ্চিন্তা থাকা সত্ত্বেও কাল রাতে ঘুমটা খারাপ হয়নি। তার একটা কারণ বোধহয় রাতে শুতে অনেক দেরি হয়েছে।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর পিসিমা-পিসেমশাইকে নিয়ে সারিকা আবার আলোচনায় বসেছে। সারিকা একরকম বাধ্য হয়েই চুনির ব্যাপারটা ওঁদের বলেছে।

শুনে পিসেমশাই তো ভয়েই অস্থির। ভয় সারিকারও করছে। কিন্তু ও তো এখন একেবারে জড়িয়ে গেছে। প্রেমনাথ ধর যা বলে গেছে তাতে দিল্লি পালিয়েও সারিকা রেহাই পাবে না। এখন একমাত্র কর্নেলকাকুই ভরসা।

পিসিমার ভয়-ডর একটু কম। একবার দেশের বাড়িতে ডাকাতদলকে চেঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে রুখে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'তুই পুলিশকে সব খুলে বল। আর আমার মিলিটারি ভাসুরকে সব জানিয়ে দে। উনি সব্বাইকে ঠাণ্ডা করে দেবেন।'

সারিকা তখন কর্নেল বিক্রম সেনের কথা বলল। বলল, 'কর্নেলকাকু সব জানেন। উনি এই মিস্ট্রি সলভ করার জন্যে খুব চেষ্টা করছেন। তোমাদের কোনও ভয় নেই। পুলিশ রয়েছে, কর্নেলকাকু রয়েছেন। তা ছাড়া যে-ভদ্রলোক আজ এসেছিলেন তিনিও আমার ফরে—এগেইনস্টে নন। সুতরাং কোনও ভয় নেই।'

এইরকম বহু তর্ক-বিতর্ক আলোচনার পর সারিকা শুতে গেছে। যাওয়ার আগে পিসিমাদের বারবার করে বলেছে, মাকে যেন ওঁরা এত কথা না জানান। তা হলে দুশ্চিন্তায় মা শেষ হয়ে যাবে।

এখন মুখ-হাত ধুয়ে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় সারিকা হঠাৎই একটা শব্দ শুনতে পেল।

কেউ ওপরতলায় নিশীথের ফ্ল্যাটে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

একটু চিন্তিত মনেই ব্রেকফাস্ট সারল ও। তারপর পোশাক পরে বেরোতে

যাবে, শুনল দরজায় কারও নক করার শব্দ। শব্দে ... কেউ কাউকে চেনে
নিঃসন্দেহে সেকেন্ডে দুবারেরও বেশি। অতএব যে-ই ওর দরজায়
তার প্রয়োজনটা খুব জরুরি। ... গেল। সারিকা নিঃশব্দে
দরজা খুলতেই সারিকা জারিন আগরওয়ালের মুখোমু... য়ে গেল দরজার দিকে।
তীব্র উত্তেজনার ছায়া। যেন ভীষণ কিছু একটা ... ফসারের মুখোমুখি হল সারিকা।
সারিকা প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার?' ...শের তদন্তে এসেছিলেন। সারিকাকে
'নিশীথ—নিশীথ ফিরে এসেছে।' ...সলেন : 'মিস্টার সান্যাল ফিরেছেন?'
সারিকা বুকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খে... রে দাঁড়াল একপাশে।
ও বলে উঠল, 'চলো তো, দেখি—।' আহ্বানেই একটা চেয়ার দখল করলেন।
ওরা দুজনে ক্ষিপ্রপায়ে সিঁড়ি ভেঙে ... সান্যাল,' নিশীথ মাথা তুলে তাকাল
নিশীথের ফ্ল্যাটের কাছে এসে দরজায় ... একটা স্টেটমেন্ট দিতে হ...
দরজা বন্ধ। তখন অধৈর্য হয়ে দরজায় ধা...
একটু পরেই দরজা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে...
দেখেই ওর মুখে পরিচয়ের হাসি ফুটে উঠল। একপা... ...নি,
আহ্বান জানাল, 'এসো, ভেতরে এসো।'
ওরা ইতস্তভাবে ধীরে-ধীরে ঘরে ঢুকল। ...ল সারিকার।
দরজা ভেজিয়ে দিল নিশীথ। ফিরে এসে চেয়ারে বসল। ওদের... অসম্ভব!
অনুরোধ করল। ...া : 'এক

কিন্তু সারিকা আর জারিন তখন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে দেখছে। আমি মাঝে-মাঝেই ফিরে তাকাচ্ছে নিশীথের দিকে। যেন কোনও অপরিচিত মানুষের অপরিচিত ফ্ল্যাটে ঢোকার প্রথম সুযোগ পেয়েছে ওরা।

প্রাথমিক বিস্ময়ের ভাবটা কাটিয়ে উঠে চেয়ারে বসল জারিন ও সারিকা। ওদের সামনে বসা নিশীথ সান্যাল যেন এক দূরের মানুষ। ওদের মাঝের অদৃশ্য দেওয়াল এই দু-দিনেই যেন অনেক শক্তপোক্ত হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সারিকা গম্ভীর গলায় বলল, 'এ ক'দিন কোথায় ছিলে জানতে পারি?' নিজের অজান্তেই নিশীথকে 'তুমি' করে কথা বলে ফেলল সারিকা।

'কলকাতার বাইরে—শান্তিনিকেতনে।' নিশীথের স্বর অত্যন্ত সহজ, দ্বিধাহীন।

'কারণ?' এবারের প্রশ্ন জারিনের।

'এই, ব্যাপার কী বলো তো?' চমকে উঠল নিশীথ। উঠে দাঁড়াল, 'তোমরা দুজনে এমনভাবে জেরা শুরু করেছ, যেন আমি কোনও বিরাট অপরাধ করে ফেলেছি। কী ব্যাপার?'

'অপরাধ করেছ, তবে বিরাট কি না বলতে পারি না।' সারিকা বাঁকা সুরে জবাব দিল। নিশীথের চোখে চোখ রেখে বলল, 'তুমি বাদশা থেকে উধাও

...কিউলিয়ার অনেক কিছু ঘটে গেছে।'

...পিকিউলিয়ার! কী সব আবোলতাবোল বকছ, সারিকা?' নিশীথ ...ক। বোধহয় ভাবছে, সারিকার মাথা ঠিক আছে কি না

...চমকে উঠল : 'সে কী! তোমার কি মেমারি ...দশায় খেতে ঢুকলাম। ট্যাক্সি করে এক বন্ধুকে ...মি সেই যে বেপাত্তা হলে, তারপর এই ...পারটা স্বাভাবিক? শান্তিনিকেতনে তোমার ...লে-কয়ে হুট করে চলে গেলে!' ...র মাথায় কোনও গণ্ডগোল হয়নি তো?' ...র প্রশ্ন করল নিশীথ।

...মালা কেনার ব্যাপারটাও তোমার মনে নেই!' ...রাস্তায় দেখা সেই অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারটাও ...কার করতে ইচ্ছে করছে?' সারিকা চেয়ার ছেড়ে উঠে

...! এসব তুমি বলছ কী, সারিকা?' নিশীথ শূন্য দৃষ্টিতে একবার ...রিনের দিকে, তারপর চোখ ফেরাল সারিকার দিকে।

...জারিন, আমার মনে হয় নিশীথের ফিরে আসার ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো ...কার। তুমি কাইন্ডলি থানায় ফোনটা করো, তারপর ইন্সপেক্টর দেশাইকে ডেকে পাঠাও। বলো, ব্যাপারটা জরুরি।'

'পুলিশ! এর মধ্যে পুলিশ আসছে কোত্থেকে!' নিশীথের ধৈর্যের বাঁধন যেন ছিঁড়ে গেছে : 'আমি যে দিদির বাড়ি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম, তার জন্যেও পুলিশের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে!'

'না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।' ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল জারিন, 'তোমার উধাও হওয়ার খবরটা পুলিশে জানিয়েছিল সারিকা। তারাও হয়তো তোমার খোঁজ করছে। তাই তোমার ফিরে আসার খবরটা তাদের জানানো দরকার।' জারিন আর দাঁড়াল না। পা বাড়াল নিশীথের ফোনের দিকে।

'জানি না, তুমি ঠাট্টা করছ, না সত্যিই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' গম্ভীরভাবে বলল সারিকা, 'কিন্তু তোমার এ-ঘরে কাল রাতে প্রেমনাথ ধর নামে একজন লোক এসেছিল—বহ্নিশিখার খোঁজে।'

নিশীথের দু-চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। ও মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। মাথাটা গুঁজে দিল দু-হাতের ফাঁকে।

জারিন ফোন রেখে ফিরে এসে বসল চেয়ারে : 'মিস্টার দেশাই এখুনি আসছেন।' সংক্ষিপ্তভাবে জানাল ও।

তারপর ওরা তিনজনেই চুপচাপ বসে রইল। যেন কেউ কাউকে চেনে না।

প্রায় কুড়ি মিনিট পর দরজায় নক করার শব্দ শোনা গেল। সারিকা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। নিশীথের দিকে একপলক দেখে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

দরজা খুলতেই এক দশাসই প্রবীণ পুলিশ অফিসারের মুখোমুখি হল সারিকা। গতকাল সকালে তিনিই নিশীথ-নিরুদ্দেশের তদন্তে এসেছিলেন। সারিকাকে দেখেই পরিচিতের একফালি হাসি হাসলেন : 'মিস্টার সান্যাল ফিরেছেন?'

'হ্যাঁ। ভেতরে আসুন।' সারিকা সরে দাঁড়াল একপাশে।

ইন্সপেক্টর দেশাই এগিয়ে এসে বিনা আহ্বানেই একটা চেয়ার দখল করলেন। নিশীথের দিকে ফিরে বললেন, 'মিস্টার সান্যাল,' নিশীথ মাথা তুলে তাকাল 'আপনাকে এই মিসিং হওয়ার ব্যাপারে একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে।'

'লিখে নিন।' বিরক্ত স্বরে জবাব দিল নিশীথ।

'এখানে নয়—থানায় গিয়ে।'

'চলুন—।' নিশীথ উঠে দাঁড়াল।

সেই মুহূর্তেই নিশীথের জামার হাতার দিকে নজর পড়ল সারিকার। চমকে উঠল। সমস্ত কিছুর যোগফল যা দাঁড়াচ্ছে তাতে...উঁহু, অসম্ভব! কিন্তু...একটা সন্দেহের ঝোঁকে নিশীথের সামনে এসে দাঁড়াল সারিকা : 'এক মিনিট, ইন্সপেক্টর দেশাই—এই নিশীথ সান্যালকে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট আমি করতে চাই।'

'করুন।' দেশাই সম্মতি দিলেন।

'নিশীথ, একটু পাশ ফিরে দাঁড়াও—প্লিজ।'

নিশীথ পাশ ফিরে দাঁড়াল। ওর বাঁ গালটা কয়েক সেকেন্ড স্থির চোখে খুঁটিয়ে দেখল সারিকা। তারপর ঘুরে তাকাল ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের দিকে।

'ইন্সপেক্টর, গোড়াতেই একটা বিশাল ভুল আমরা করে বসে আছি। এই লোকটি আদৌ নিশীথ সান্যাল নয়।'

।। আট ।।

'তার মানে!' ইন্সপেক্টরের ভুরুজোড়া কপালে উঠল।

'তার মানে, এই লোকটি একটি তৃতীয় শ্রেণীর জালিয়াত।' সারিকা শক্ত গলায় জবাব দিল।

নিশীথের শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে।

'কী বলছ সারিকা!' জারিনের হৃৎপিণ্ড যেন হোঁচট খেল।

'ঠিকই বলছি। এ পর্যন্ত যে ক'টা কথা আমি বলেছি, তার সব ক'টাই এই লোকটি অস্বীকার করেছে। বলেছে, বাদশায় সে আমার সঙ্গে যায়নি, নিউ মার্কেট তো দূরের কথা। অথচ পরশু সন্ধ্যায় আমি আর নিশীথ একসঙ্গে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক ঘুরেছি। তারপর কীভাবে সে হঠাৎ "আসছি" বলে উধাও হয়ে যায়, সে-কথা তো আপনাকে কালই বলেছি, ইন্সপেক্টর দেশাই।'

'হ্যাঁ, তা বলেছেন।' দেশাই স্বীকার করলেন, 'কিন্তু ইনি কি সেসব কথা ডিনাই করছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, করছেন। ...তা ছাড়া আরও প্রমাণ রয়েছে—অবশ্য সেগুলোকে ঠিক প্রমাণ বলা যায় কি না জানি না। আসল নিশীথ সবসময় কাফলিঙ্ক ব্যবহার করত, কিন্তু এর বেলা তার ব্যতিক্রম দেখছি। আর সবচেয়ে ইমপরট্যান্ট হল, আসল নিশীথের বাঁ গালে একটা ছোট আঁচিল আছে। অথচ, এর গালে সেরকম কিছু আমার নজরে পড়ছে না। জানি না, আমার চোখ খারাপও হতে পারে।'

'হুঁ—' চিন্তিতভাবে জবাব দিলেন দেশাই, 'আচ্ছা, মিস মুখার্জি, মিস্টার সান্যালকে খুব ভালোভাবে জানেন এমন কোনও লোক আপনার সন্ধানে আছে? তা হলে তাকে দিয়েও আমরা আসল-নকল শনাক্ত করতে পারি।'

'আপনি কি আমার কথায় সন্দেহ করছেন, ইন্সপেক্টর?' সারিকা একটু অভিমানী স্বরে বলে উঠল, 'আপনি এখুনি একে অ্যারেস্ট করুন।'

'আপনার কথায় সন্দেহ না করলেও আমার নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার, মিস মুখার্জি। উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে আমার পক্ষে কোনওরকম লিগাল স্টেপ নেওয়া সম্ভব নয়।'

এবার নকল নিশীথ মুখ খুলল, 'ইন্সপেক্টর, আপনি আমার অফিসে খোঁজ করতে পারেন। মডার্ন মেশিন টুল্‌স কোম্পানিতে আমি চাকরি করি। নাকি সেটাও বানিয়ে বলছি, সারিকা?' সারিকার দিকে ফিরে ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল ও।

'আসল নিশীথ সান্যাল ওই কোম্পানিতেই চাকরি করে।' ভাবলেশহীন মুখে যান্ত্রিক স্বরে বলল সারিকা।

'...অথবা আপনি এই পাতিল ম্যানসনেরই অন্যান্য বাসিন্দাকে ডেকে আনতে পারেন আমাকে শনাক্ত করার জন্যে।'

'তারা শনাক্ত করতে হবে ভেবে কোনওদিন আসল নিশীথের দিকে তাকায়নি। স্বীকার করছি, তোমার সঙ্গে আসল নিশীথের চেহারার অনেকটা

মিল আছে, কিন্তু তাই বলে আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে এমন আশা করা অন্যায়।'

জারিন এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। সারিকার কথা শেষ হতেই ও বলে উঠল, 'তোমারই হয়তো ভুল হচ্ছে, সারিকা। আমি তো সন্দেহ করার কিছু দেখছি না।'

'না, ভুল আমার হচ্ছে না। বরং তোমার এই আচমকা সাপোর্টের পেছনে কি ইন্টারেস্ট আছে ভেবে অবাক হচ্ছি।' সারিকা তিক্তস্বরে ঝাঁঝিয়ে উঠল।

ইন্সপেক্টর দেশাই এবার এগিয়ে এসে বাধা দিলেন : 'আপনাদের উত্তেজিত হওয়ার কোনও দরকার নেই। এখুনি সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মিস্টার সান্যাল—' নিশীথের দিকে ফিরলেন দেশাই : 'গেট রেডি। এখন প্রায় দশটা বাজে। আমরা এখন মডার্ন মেশিন টুল্‌স-এ যাব।'

জারিন আর সারিকা একইসঙ্গে চোখ রাখল নিশীথের চোখে। বুঝতে চাইল, ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের এই সরাসরি চ্যালেঞ্জে সে দ্বিধাগ্রস্ত কি না।

কিন্তু নিশীথ যেন ইন্সপেক্টরের কথা লুফে নিল। সাগ্রহে বলল, 'চলুন, সেই ভালো। মেয়েগুলো তা হলে পাগলামি থেকে একটু রেহাই পাবে।'

'নিশীথ, আমি কিন্তু তোমাকে মোটেই সন্দেহ করছি না।' অনুযোগের সুরে জারিন প্রতিবাদ করল।

'তা করছ না, তবে মন খুলে সাপোর্ট করছ বলেও তো মনে হচ্ছে না!' নিশীথের বাঁকা জবাবে চুপ করে গেল জারিন।

ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের ইঙ্গিতে ওরা তিনজনে ঘর ছেড়ে বেরোল।

ছ'তলায় নেমে ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের কাছে একমিনিট সময় চাইল সারিকা। তারপর চটজলদি পিসিমাকে জানিয়ে এল, জরুরি কাজে ও ঘণ্টাখানেকের জন্য বেরোচ্ছে। চিন্তার কিছু নেই।

বাইরের রাস্তায় পুলিশের একটা জিপ দাঁড়িয়েছিল। দেশাইয়ের দেখাদেখি সকলেই চুপচাপ জিপে গিয়ে উঠল। দেশাই নিজেই গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন।

জিপের পিছনের আসনে বসে ওরা তিনজন। একেবারে নিশ্চুপ। একটা বিশ্রী থমথমে আবহাওয়া গাড়ির ভেতরে যেন জমাট বেঁধেছে।

মডার্ন মেশিন টুল্‌স-এর সামনে গাড়ি যখন থামল, তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। দেশাই স্টার্ট বন্ধ করে জিপ থেকে নামলেন। নিশীথকে লক্ষ করে বললেন, 'মিস্টার সান্যাল, আপনি এগোন—আমরা পেছন-পেছন যাচ্ছি।'

নিশীথ সামান্য ভ্রূকুটি করেই অফিস বিল্ডিংয়ের ভেতরে পা বাড়াল। চলার ভঙ্গি দেখে স্পষ্টই মনে হল এ-অফিস ওর বহুদিনের চেনা।

নিশীথকে অনুসরণ করে ওরা তিনতলায় এসে পৌঁছল। সুদৃশ্য কাচের

সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল নিশীথ। পিছনে জারিন, সারিকা ও ইন্সপেকটর দেশাই।

ঘরে ঢুকতেই নিশীথ এক সুন্দরী মহিলার মুখোমুখি হল। ওকে দেখেই মেয়েটি একগাল হাসল : 'কোথায় ছিলেন এ দু-দিন। একেবারে নো ট্রেস!'

নিশীথ মৃদু হেসে চোখ ঠারল : 'এ স্পেশাল ট্রিপ অন নটি বিজনেস।' তারপর সারিকার দিকে ফিরে বলল, 'আমাদের স্টেনো, সোনালী অরোরা।'

মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে ওরা এগিয়ে চলল একটা পার্টিশানের দিকে।

সারিকা ইতিমধ্যেই চিন্তিত এবং গম্ভীর হয়ে পড়েছে। তা হলে কি ওর ভুল হয়েছে। কিন্তু সেটাই বা কী করে সম্ভব! যে-নিশীথের সঙ্গে ও প্রায় সারাটা সন্ধে ঘুরে বেড়িয়েছে, পরে সে-ই কিনা আজ সব অস্বীকার করছে! না, এই লোকটা যে নিশীথের নাম ভাঁড়িয়ে ওর জায়গা নিতে এসেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তা হলে আসল নিশীথের কী হল! তেমন গুরুতর কিছু হয়নি তো! তা ছাড়া, অফিসের স্টেনোরা নেহাত প্রয়োজন ছাড়া অফিসের কর্মীদের কাছে যাতায়াত করে না। হয়তো তেমনভাবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তাদের চেহারাও জরিপ করে দ্যাখে না। সুতরাং সোনালী অরোরার ভুলও হতে পারে। এমন একজন লোককে সারিকার দরকার, যে ছোটবেলা থেকেই নিশীথের সঙ্গে মিশেছে, তাকে হাড়ে-হাড়ে চেনে, জানে এবং বোঝে। কিন্তু হাতের কাছে সেরকম কাউকে ও পাচ্ছে কোথায়! তবে নিশীথের মুখেই তো ও শুনেছে যে, ওর এক দিদি আছেন। শান্তিনিকেতনে থাকেন। এ-দু-দিন তাঁর কাছেই তো ও ছিল বলে বলছে! দেখা যাক, দরকার হলে ইন্সপেক্টর দেশাই এবং এই নকল নিশীথকে নিয়ে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত দৌড়তেও ও রাজি আছে। কিন্তু আসল নিশীথের কী হল? নিশ্চয়ই সে কোনও বিপদে পড়েছে।

সারিকার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল নকল নিশীথের কণ্ঠস্বরে, 'সারিকা, ইনি আমার সঙ্গে আজ ছ'বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করছেন—জয়দীপ মিত্র।'

সারিকা হাত তুলে নমস্কার জানাল।

জয়দীপ মিত্রের বয়েস নিশীথের কাছাকাছি হবে। তার সুদর্শন চেহারায় কেমন একটা বেপরোয়া ভাব। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে সে অবাক হয়ে তাকাল সারিকা, জারিন ও ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের দিকে। তারপর নিশীথের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'কী রে, কী ব্যাপার!'

'ব্যাপার গুরুতর।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিল নিশীথ, 'এদের হঠাৎ ধারণা হয়েছে, আমি নাকি কোনও জালিয়াত, এবং আমার নাম নিশীথ সান্যাল নয়।'

'তা হলে এক কাজ কর। আমার রাঁচিতে জানাশোনা আছে। লিখে দিচ্ছি। মনে হয় তিনটে সিট খালি পেয়ে যাবি।' গম্ভীর স্বরে বলল জয়দীপ।

'মিস্টার মিত্র, ইট্‌স নট এ ম্যাটার অফ জে[illegible]' [illegible] এগিয়ে এলেন : 'মিস্টার সান্যালের আইডেন্টিফিকেশানে[illegible] ডিপেন্ড করছে।'

'ও। তা হলে আমি জয়দীপ মিত্র, বক্ষদেশে হাত রা[illegible] সম্মুখে দণ্ডায়মান যুবকের নাম শ্রীনিশীথ সান্যাল। ইহা [illegible] বিশ্বাসমতে সত্য। ও. কে.?'

জয়দীপের নাটকীয় স্বরে নিশীথ হেসে উঠল। দেশাইয়ের দিকে ফিরে একটা শ্রাগ করল : 'ইন্সপেক্টর, আমার মনে হয় আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে। চলুন, এবার ফেরা যাক।'

কিন্তু যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল নিশীথ। জয়দীপের দিকে ফিরল : 'জয়, এ-ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত আমি অফিসে আর আসছি না।'

'তোমার ইচ্ছে। তবে যাওয়ার আগে তোমার পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ করার কপিরাইটটা বড়সায়েবকে দিয়ে যেয়ো।'

মডার্ন মেশিন টুল্‌স থেকে বেরিয়ে এল ওরা চারজন।

ইন্সপেক্টর দেশাই এখন যেন ততটা দ্বিধাগ্রস্ত নন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তাঁর অবিশ্বাসের ভিতটা টলে গেছে। অন্যমনস্কভাবে তিনি জিপে উঠলেন। ওরাও উঠল।

জিপ আবার ফিরে চলল পাতিল ম্যানসনের দিকে।

নিশীথের সাততলার ঘরে এসে জমায়েত হল সবাই। এতক্ষণ ধরে যে-অদৃশ্য উৎকণ্ঠা সকলের কণ্ঠরোধ করেছিল, এখন সেটা মিলিয়ে গেল নিশীথের স্বরে, 'সারিকা, এর পরেও কোনও প্রমাণ তোমার দরকার?'

সারিকা পালটা প্রশ্ন করল, 'শুনেছিলাম তোমার এক দিদি আছেন। বলো তো কোথায় থাকেন তিনি?'

'কেন?' নিশীথ যেন প্রশ্নের তাৎপর্য খুঁজে পেল না।

'দরকার আছে। তিনি কোথায় আছেন এখন? দিল্লিতে?' ইচ্ছে করেই নিশীথকে গুলিয়ে দিতে চাইল সারিকা।

'না। শান্তিনিকেতনে—তাঁর কাছেই আমি গিয়েছিলাম গত পরশু।'

'তাই নাকি!' সারিকা অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'দেখা যাক—।'

এবার ইন্সপেক্টর দেশাই গলাখাঁকারি দিলেন : 'মিস মুখার্জি, আমি আইনের নাগপাশে বাঁধা। সুতরাং আমি প্রমাণসাপেক্ষে যা বুঝেছি, ইনি যে আসল নিশীথ সান্যাল, সে-বিষয়ে আমার আর কোনও সন্দেহ নেই। আশা করি ভবিষ্যতে আপনি আপনার ভুল বুঝতে পারবেন। তবে ওঁর হ্যান্ডরাইটিং আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট আমি টেস্ট করে দেখব। গুড নাইট এভরিবডি—।'

...র ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর দেশাই।
...চোখে তাকাল সারিকার দিকে : 'ঢের রঙ্গ হয়েছে, সারি। ...আর কখনও এভাবে হ্যারাস করতে পারো আমি কোনওদিন ... সমস্ত প্রমাণ তোমার মুখের ওপর ছুড়ে দেওয়া সত্ত্বেও তুমি ... যে ...রকম গোঁয়ার্তুমি করছ জানি না। এখন নিশীথকে একটু রেস্ট করতে দাও।'

সারিকা হাসল, বলল, 'বেশ তো, এই নিশীথের সঙ্গে তুমি যদি একা থাকতে চাও, তাতে আমি বাধা দেওয়ার কে! তবে জারিন আগরওয়াল, মনে রেখো, এর শেষ আমি দেখবই। ইন্সপেক্টরের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও এই লোকটার চালাকিতে আমি ভুলছি না। যারা একে নিশীথের জায়গা নিতে পাঠিয়েছে, বেশ শিখিয়ে-পড়িয়েই পাঠিয়েছে দেখছি। কিন্তু আগামীকাল ইন্সপেক্টর দেশাই আবার আসবেন। নিশীথের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর হ্যান্ডরাইটিং টেস্ট করলেই এই জালিয়াতটার আসল রূপটি সুড়সুড় করে বেরিয়ে পড়বে। তখন দেখব, এ-ঠাট কোথায় থাকে! গুড নাইট, মিস্টার নিশীথ সান্যাল—আজকের অভিনয়ের জন্যে আপনার প্রশংসা না করে পারছি না। তবে আগামীকালের জন্যে এখন থেকেই জারিনের সঙ্গে রিহার্সালে নেমে পড়ুন—আর সময় নষ্ট করবেন না।'

গটমট করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সারিকা। সশব্দে বন্ধ করে দিল ফ্ল্যাটের দরজা।

ঘরে দাঁড়ানো নিশীথ সান্যালের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। সে কি হাতের লেখা আর হাতের ছাপ যাচাই করার কথায়? কে জানে।

।। নয় ।।

ফ্ল্যাটে ফিরে এসে কর্নেল সেনকে ফোন করল সারিকা।

ফোন ধরল মেরিয়ন। সুরেলা গলায় প্রশ্ন করল, 'কাকে চাই?'

'কে, মেরিয়ন? আমি সারিকা বলছি।'

'বলুন—।'

'কাকু আছেন ঘরে?'

'হ্যাঁ, খেতে বসেছেন।'

'তা হলে এক কাজ করো। কাকুকে বলো, আমি দুপুরে একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। খুব জরুরি দরকার।'

'আচ্ছা।'

ফোন নামিয়ে রাখল সারিকা। তারপর ফোনগাইডটা টেনে নিল তাক থেকে। খুঁজে-খুঁজে বের করল নীরেন বর্মার ফোন-নম্বর। রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল।

একটু পরেই ও-প্রান্ত থেকে কোনও অভ্যস্ত নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'অজন্তা কিউরিয়ো শপ।'

'মিস্টার বর্মা আছেন?'

'আপনি কে কথা বলছেন?'

'বলুন মিস সারিকা মুখার্জি ফোন করছেন। বিশেষ দরকার।'

'প্লিজ হোল্ড অন—।'

মিনিটখানেক পর শোনা গেল নীরেন বর্মার ভরাট কণ্ঠস্বর, 'কে, মিস মুখার্জি?'

'হ্যাঁ, আপনি কি এখন দোকানেই আছেন?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

'আপনার সঙ্গে একটু জরুরি কথা আছে। ফোনে বলা সম্ভব নয়। আমি মিনিট কুড়ির মধ্যেই আপনার দোকানে যাচ্ছি।'

'আসুন, আমি অপেক্ষা করব—।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল সারিকা। প্রেমনাথ ধরের ব্যাপারটা মিস্টার বর্মাকে জানানো দরকার। কারণ, প্রেমনাথ ধর বহ্নিশিখার খোঁজে হয়তো আজ রাতেই নীরেন বর্মা বা আনন্দ কাপুরের বাড়িতে হাজির হবে। ওঁদের সাবধান করে দেওয়া সারিকার কর্তব্য। তা ছাড়া, এই নকল নিশীথের ব্যাপারটা নিয়ে ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়েছে ও। কী করবে ঠিক করতে পারছে না। নীরেন বর্মাকে সব কথা জানানো কি ঠিক হবে?

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্তে এল সারিকা। ও আনন্দ কাপুরকে না বললেও মিস্টার বর্মা এবং বিক্রম সেনকে সবকিছু খুলে বলবে। গতকাল রাতে ডক্টর কাপুর প্রেমনাথ ধরকে অনুসরণ করছেন দেখে ও ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। তা হলে রোহিত রায়কেও কি অনুসরণ করছিলেন আনন্দ কাপুর। কিন্তু তাঁর হাঁটা-চলা দেখে তো স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। পা টেনে তো তিনি চলেন না! তা হলে কি প্রেমনাথ ধরই...?

আর ভাবতে পারল না সারিকা। সব কিছু যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে মাকে বলে ও বেরিয়ে পড়ল। গন্তব্য—কিউরিয়ো শপ।

গভর্নমেন্ট প্লেসে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের কাছাকাছি দোকানটা। দোকানের মাপ নেহাত অগ্রাহ্য করার মতো নয়। গেটের বাইরে উর্দিপরা দারোয়ান থেকে শুরু করে সেলস্-গার্ল সবই আছে।

একটু আড়ষ্ট পায়ে দোকানে ঢুকল সারিকা। দোকানের ভেতরটা কেমন অন্ধকার-অন্ধকার। বেশ কয়েকটা উলঙ্গ বাল্‌ব সিলিংয়ে লাগানো। তাদের কর্কশ আলো সাজানো কিউরিয়োগুলোর ওপর ঠিকরে পড়ছে। আর কিউরিয়োগুলো যেন সেই ঠিকরে পড়া আলোকে শুষে নিচ্ছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে নীরেন বর্মাকে খুঁজে বের করার আগে তিনিই দেখতে পেলেন সারিকাকে। সহাস্যে এগিয়ে এলেন। আলো পড়ে তার কপালের দু-পাশে রুপোলি রেখা চিকচিক করে উঠল। পরনের কালো স্যুট এবং গলায় লাগানো রক্ত-লাল টাই তাঁর পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় দিচ্ছে।

'আসুন, মিস মুখার্জি, ওয়েলকাম টু মাই বিজনেস প্লেস।'

সারিকা হেসে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটু জরুরি কথা ছিল। যদি...।'

'চলুন, পেছনের অফিসে বসেই কথা বলা যাবে।'

দোকানের বাঁ দিকে ভারি পরদা দেওয়া একটা দরজা। পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢোকার আগে সামনে দাঁড়ানো একজন সেল্‌সম্যানকে ডাকলেন নীরেন বর্মা : 'মেহেরা, যদি কেউ আমার খোঁজ করে তা হলে বলবে আমি নেই—অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্যে।'

পরদা সরিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকল সারিকা। নীরেন বর্মা হাত বাড়িয়ে আলো জ্বাললেন। তারপর ডেস্কের ওপাশে গিয়ে বসলেন। টেবিলে রাখা কাগজপত্র একপাশে সরিয়ে রেখে বললেন, 'বসুন, মিস মুখার্জি, বলুন, জরুরি ব্যাপারটা কী?'

'কাল রাতে একজন লোক আমাদের ফ্ল্যাটে এসেছিল—ওই পাথরটার খোঁজে।'

'বলেন কী! তারপর?'

প্রেমনাথ ধরের সমস্ত ঘটনাই বলে গেল সারিকা। রোহিত রায়ের প্রসঙ্গও বাদ দিল না। সবশেষে বলল, 'সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল, ডক্টর কাপুরকে অত রাতে দেখে—' প্রেমনাথ ধরকে অনুসরণ করার ব্যাপারটা বলল ও।

'তাই নাকি! তা হলে তো আর সন্দেহ নেই। বহ্নিশিখা নির্ঘাত ওই কাপুর সরিয়েছে। লোকটার হাঁটা-চলাই যেন আমার কেমন-কেমন লাগে।'

'আমি কিন্তু প্রেমনাথ ধরকে আপনার আর কাপুরের নাম বলেছি। সে আপনাদের কাছে হয়তো আসবে। তাই আগে থাকতেই জানিয়ে গেলাম।'

'ও—।' একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন নীরেন বর্মা। কিন্তু পরমুহূর্তেই স্বভাবসিদ্ধ হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'যাকগে, চুনিটাতো আর আমার কাছে নেই! বিপদে পড়লে আনন্দই পড়বে। তবুও সাবধান থাকা ভালো।... আচ্ছা, এইমাত্র যে নিশীথ সান্যালের ব্যাপারটা বললেন, মানে—আপনি কি শিয়োর যে, লোকটা

একটা ইম্পস্টার?'

'আমি শিয়োর বলেই তো ইন্সপেক্টরকে বলব, আগামীকাল নিশীথ সান্যালের হাতের লেখার সঙ্গে এই জালিয়াতটার হাতের লেখা মিলিয়ে দেখতে। তখনই সব ধরা পড়ে যাবে।'

'কিন্তু এই লোকটি নিশীথের জায়গা নিতে চাইছে কোন উদ্দেশ্যে?' নীরেন জানতে চাইলেন।

'মনে হয় বহ্নিশিখার খোঁজে। কারণ আগেই তো আপনাকে বলেছি, নিশীথের কাছে খালি বাক্স দেখে প্রেমনাথ ধর কেমন ধোঁকা খেয়ে গিয়েছিল। এই লোকটি হয়তো ভাবছে চুনিটা নিশীথের কাছেই আছে। দেখি, কাল মনে হয় সব জানতে পারব।' সারিকা উঠে দাঁড়াল : 'আজ তা হলে চলি। পরে একদিন ফোন করে সব জানাব আপনাকে।'

'আচ্ছা। ডক্টর কাপুরের কাছ থেকে সাবধানে থাকবেন। লোকটা সুবিধের নয়।' নীরেন বর্মাও উঠে দাঁড়ালেন : 'ও—ভালো কথা। আমি ওই যে ক্যাটালগের কথা বলেছিলাম না, সেটাতে একটা বড় চুনির ছবি আছে। তার নামও বহ্নিশিখা। তবে কোনওরকম হার বা চেন ওটার সঙ্গে লাগানো নেই।'

'তা হলে হয়তো এই পাথরের ছবিই হবে। তা ছাড়া প্রেমনাথ ধর তো বলেইছে, চেনটা রোহিত রায় নিজে লাগিয়ে নিয়েছে। আচ্ছা, আপনি সাবধানে থাকবেন কিন্তু...।'

'আমার জন্যে চিন্তা করবেন না।' পকেট থেকে একটা মুখভোঁতা অটোমেটিক বের করলেন নীরেন বর্মা। হাসলেন : 'লাইসেন্স করা আত্মরক্ষার অস্ত্র—অতএব নিশ্চিন্ত থাকুন।'

বিদায় নিয়ে রাস্তায় নামল সারিকা। বাড়ির দিকে রওনা দিল। স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে ওকে আবার বেরোতে হবে। দেখা করতে হবে কর্নেল সেনের সঙ্গে।

দুপুর দুটো নাগাদ সতীশ মুখার্জি রোডে কর্নেল সেনের বাড়িতে পৌঁছল সারিকা। বাগান এবং বাড়ির সমন্বয়কে যদি বাগানবাড়ি বলা যায়, তা হলে কর্নেল সেনের বাড়িটা তাই। লম্বা টানা সিমেন্ট বাঁধানো পথ গিয়ে শেষ হয়েছে একফালি বাগানের প্রান্তে। সেখানে ফুলের চেয়ে সবুজ পাতার সমারোহই বেশি। বাগানের গায়েই টান-টান হয়ে দাঁড়ানো তিনতলা সাদা ধবধবে বাড়িটা।

শুরুর গ্রিলের দরজাটা পার হয়ে বাড়ির সদর দরজায় এসে দাঁড়াল সারিকা।

কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল।

দরজা খুলল মেরিয়ন। নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল সারিকা। মেরিয়ন দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল।

কর্নেল বিক্রম সেন ড্রইংরুমেই বসেছিলেন। গায়ে জড়ানো একটা ধূসর শাল। হাতে একটা বই—মনে হল গল্পের বই।

সারিকাকে দেখতে পাননি কর্নেল সেন। গল্পের বইটায় একেবারে ডুবে ছিলেন। সারিকা কাছে এগিয়ে যেতেই ওর উপস্থিতি টের পেলেন। মুখ তুললেন।

'কী রে, এসেছিস?' হেসে হাতের বইটা বন্ধ করে রাখলেন তিনি।

সারিকা দেখল, ওটা একটা গোয়েন্দা গল্পের বই। ওর নজর অনুসরণ করে বিক্রম সেন কিছু একটা যেন আঁচ করলেন, বললেন, 'একটা ডিটেকটিভ গল্প পড়ছিলাম। দেখলাম কী জানিস! শুধু বিশ্লেষণ আর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণই একজন গোয়েন্দাকে জাতে তুলতে পারে—যাকগে, তুই কী বিশেষ দরকার আছে বলেছিলি মেরিয়নকে?'

সারিকা চোখ ফেরাতেই দেখল মেরিয়ন তখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। শুধুই মেয়েলি কৌতূহল, না আর কিছু?

কর্নেল সেনও ব্যাপারটা লক্ষ করলেন। তারপর বেশ গম্ভীরস্বরে বললেন, 'মেরিয়ন, যাও—হাতের কাজ সেরে নাও গিয়ে।'

'সব কাজ হয়ে গেছে আমার।' মেরিয়ন জবাব দিল।

ওর ইচ্ছেটা বুঝতে বিক্রম সেনের অসুবিধে হল না। বললেন, 'সব কাজ যখন হয়ে গেছে, তখন দাড়ি কামানোটা সেরে নাও। বিকেলের জন্যে আর ফেলে রাখবে কেন!'

সঙ্গে-সঙ্গে ঘর ছেড়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল মেরিয়ন।

সারিকা আর হাসি চাপতে পারল না। গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

কর্নেল সেনও হাসলেন : 'মাঝে-মাঝে এমন গোঁয়ার্তুমি করে মেয়েটা, কড়া কথা না বলে উপায় থাকে না। ...তা বল, কী বলবি?'

'কাকু—নিশীথ সান্যাল ফিরে এসেছে।'

'তাই নাকি?...তবে আর তোর চিন্তা কী?'

'কিন্তু এ-নিশীথ সে-নিশীথ নয়—একজন জালিয়াত।' সারিকা মাথা নিচু করে বলে চলল, 'আমার চিনতে ভুল হয়নি।'

কর্নেল সেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরপর ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনাগুলোকে একটা ছকে ফেলতে চাইলেন। কিন্তু জটিল ঘটনার সমারোহ আরও জটিল হয়ে গেল।

গতরাতের প্রেমনাথ ধরের ঘটনা থেকে শুরু করে আনন্দ কাপুরের

অনুসরণ—নিশীথের আবির্ভাব, অফিসে অনুসন্ধান—সব কিছু একে-একে বলে গেল সারিকা।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনে চললেন বিক্রম সেন। সারিকার কথা শেষ হলে বললেন, 'আচ্ছা, সারি—' সারিকা মুখ তুলে তাকাল, 'নিউ মার্কেটের দোকানটায় তোর সঙ্গে নিশীথের যখন দেখা হয়, তখন তুই আগে ওকে চিনতে পারিস, না ও তোকে দেখে এগিয়ে আসে?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল সারিকা। তারপর নিশ্চিত স্বরে বলে উঠল, 'কাকু, সত্যি বলতে কি, নিশীথ আমাকে দেখে প্রথমটা ঠিক চিনতে পারেনি। আমি ওকে ডাকতেই ও বেশ একটু ইতস্তত করে এগিয়ে আসে। ও যে প্রথমটা কেন অমন অপরিচিতের ভান করল, ঠিক বুঝতে পারিনি।'

কর্নেল সেন তখনও একইভাবে চোখ বুজে গভীর চিন্তায় মগ্ন। সারিকা থামতেই তিনি চোখ খুললেন : 'দেখি তোর হাতটা।'

সারিকা ভীষণ অবাক হয়ে গেল। হতভম্ব মুখে ওর ডান হাতটা ধীরে-ধীরে সামনে বাড়িয়ে ধরল।

কর্নেল সেন ওর হাতটা হাতে নিয়ে দেখলেন। অনামিকায় একটা আংটি—তাতে কারুকাজ করে সারিকার নামের প্রথম অক্ষর 'এস' লেখা।

'তা হলে আমার সন্দেহই দেখছি ঠিক—' আত্মগতভাবেই উচ্চারণ করলেন বিক্রম সেন।

সারিকা সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকাতেই কর্নেল সেন হাসলেন : 'তুই তো বলছিলি নিশীথের এক দিদি শান্তিনিকেতনে থাকে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে এক কাজ কর। আগামীকাল সকালে আমার বাড়িতে তাকে যেমন করে হোক নিয়ে আয়। তারপর এই নকল নিশীথকে এখানে ডাক। নিজের ভাইকে চিনতে নিশ্চয়ই কেউ ভুল করবে না! আর নিশীথও আগে থাকতে জানতেই পারবে না, ওকে কেন ওই সময়ে আমার বাড়িতে ডাকা হয়েছে।'

প্রস্তাবটা সারিকার মনে ধরল। ও সানন্দে সম্মতি জানাল : 'ঠিক আছে, আমি আজই অনন্যাদেবীকে একটা টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি। বলছি, কাল দশটার সময় তোমার বাড়িতে আসতে—।'

'কী—কী নাম বললি?' বিক্রম সেন হঠাৎই কৌতূহলী হয়ে পড়লেন।

'অনন্যা—অনন্যা রায়। নিশীথের দিদির নাম।'

'ফেমাস সোস্যাল ওয়ার্কার? আর পশ্চিমবঙ্গ নারী সমিতির সেক্রেটারি?'

'হ্যাঁ, কেন?' সারিকা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'তা হলে তাঁকে টেলিগ্রামে জানাবি, তাঁর মহিলা তহবিলে জনৈক কর্নেল

সেন হাজারদশেক টাকা চাঁদা দিতে ইচ্ছুক। তা হলে এখানে আসার কারণ সম্পর্কে ওঁর মনে কোনওরকম সন্দেহ থাকবে না। আর আমিও আমার কাজটা সেরে নিতে পারব।'

'গ্র্যান্ড আইডিয়া, কাকু।' সারিকা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : 'আমি তা হলে এখনই যাই—নিশীথের কাছ থেকে ঠিকানাটা নিয়ে টেলিগ্রামটা করে দিই—।'

'এক মিনিট, সারি—' গম্ভীরভাবে বললেন বিক্রম সেন, 'একটা জরুরি কথা তোকে জানানো হয়নি।'

'কী কথা?' সংশয়ে সারিকার ভুরু কুঁচকে উঠল।

'কথাটা কাল সন্ধ্যায় হারানো বহ্নিশিখাকে নিয়ে—' মাথার কাঁচা-পাকা চুলে হাত চালালেন কর্নেল সেন : 'ওটা হারায়নি, সারি, কেউ চুরি করেছে।'

'আমি আগেই জানতাম!' উত্তেজিত হয়ে সামনের টেবিলে একটা চাপড় কষিয়ে দিল সারিকা : 'আমিও ঠিক সেই সন্দেহই করেছি।'

'বহ্নিশিখাটা আমিই চুরি করেছি, সারিকা।'

ঘরের মধ্যে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

॥ দশ ॥

প্রায় সাতাশ সেকেন্ড সারিকা বাকরুদ্ধ হয়ে চেয়ে রইল কর্নেল সেনের দিকে। তারপর অস্ফুষ্ট চাপা স্বরে বলল, 'কাকু—তুমি—তুমি!'

'হ্যাঁ—আমিই।' মুচকি হাসলেন বিক্রম সেন : 'বহ্নিশিখা এখন আছে আমার সিন্দুকে। দেখবি?'

সারিকা চুপ।

হুইলচেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে দেওয়ালে গাঁথা সিন্দুকের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। কম্বিনেশন চাকতি ঘুরিয়ে লোহার ভারি দরজাটা খুলে ধরলেন। সারিকা যন্ত্রচালিতের মতো এসে দাঁড়াল কর্নেল সেনের পিছনে।

সিন্দুকের ওপরের তাকেই নিরীহভাবে পড়ে রয়েছে বহ্নিশিখা।

সারিকার দিকে ফিরে হাসলেন কর্নেল সেন। তারপর সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

'কাল রাতে আনন্দ আর নীরেন যখন আমাকে সার্চ করেছিল, তখন পাথরটা আমি লুকিয়ে ফেলেছিলাম আমার হুইলচেয়ারের গদির নীচে। সবাই চলে যাওয়ার পর আবার বের করে নিই পাথরটা। কিন্তু, সারি, পাথরটা আমি

কেন চুরি করেছিলাম জানিস? কারণ, আমি জানতাম এই পাথরটার জন্যেই তুই বিপদে পড়বি। তা ছাড়া কাল সন্ধেবেলা প্রথম নজরেই আমি বুঝতে পারি পাথরটা নকল নয়, আসল। এখন নীরেন আর আনন্দ থেকে শুরু করে প্রেমনাথ ধর পর্যন্ত জানে বহ্নিশিখা উধাও হয়ে গেছে। তাই কেউই আর পাথরটার জন্যে তোকে বিরক্ত করবে না। সবাই ভাববে পাথরটার হদিস আর সকলেরই মতো তোরও অজানা।'

সারিকার থমথমে মুখে ধীরে-ধীরে হাসি ফুটল। সমস্ত ঘটনার তাৎপর্য ক্রমশ স্পষ্ট হল ওর কাছে। কর্নেল সেন যে ওকে বাঁচানোর জন্যই চুনিটা লুকিয়েছেন, সে-বিষয়ে ওর মনে আর কোনও সন্দেহই রইল না।

'একটা ব্যাপারে তোকে কথা দিতে হবে।' কর্নেল সেন বলে চললেন, 'তুই এই বহ্নিশিখার সন্ধান কাউকেই আর বলবি না। এটা যে আমার কাছে আছে, তোর মুখ থেকে এ-কথা যেন না বেরোয়। আমাকে কথা দে।'

'কথা দিলাম।' হাসল সারিকা : 'তবে একটা জিনিস আমি আজ আবিষ্কার করেছি, কাকু। যত রাজ্যের গোয়েন্দাকাহিনী পড়ে-পড়ে তুমি নিজেও একজন পাকা গোয়েন্দা হয়ে উঠেছ।'

'তার আরও পরিচয় আগামীকাল সকালে তুই পাবি। একটা সাঙ্ঘাতিক কিছুর জন্যে নিজেকে তৈরি করে রাখ।'

সারিকা স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কর্নেল সেনের মর্মভেদী নজরের দিকে। তারপর বলল, 'আমি এখন তা হলে যাই, টেলিগ্রামটা করে দিই গিয়ে ...।'

বিদায় নিয়ে সারিকা এসে নামল রাস্তায়। ওর মনে বয়ে চলল চিন্তার ঝড়। হারানো বহ্নিশিখাকে ঘিরে যেন ছত্রিশ লোকের জটলা। প্রেমনাথ ধর, নীরেন বর্মা, আনন্দ কাপুর, মেরিয়ন, নকল এবং আসল নিশীথ সান্যাল, জারিন আগরওয়াল। কিন্তু এর জট কে খুলবে?

এ পর্যন্ত সারিকা শুধু জেনেছে বহ্নিশিখার ইতিহাস আর প্রেমনাথ ধরের পরিচয়—অবশ্য তার বলা কাহিনী যদি সত্যি হয়। তা ছাড়া হারানো চুনির জন্যই মারা গেল রোহিত রায়। কে খুন করল তাকে? কেন খুন করল? বহ্নিশিখার জন্য? নীরেন বর্মা আর ডক্টর আনন্দ কাপুর দুজনেই চুনিটা চুরির ব্যাপারে পরস্পরকে সন্দেহ করছেন। এ কি শুধুই সন্দেহ? নাকি এর পিছনে যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য আছে? তার ওপর রয়েছে নকল এবং আসল নিশীথের জটিল সমস্যা, অনুসরণকারীর সেই ছদ্মোময় অদ্ভুত অনুসরণ।

সারিকা হার মানল। না, এ-জটিলতার সমাধান করা ওর পক্ষে অসম্ভব। রাস্তার যান্ত্রিক পরিবেশে মনকে ভাসিয়ে দিয়ে বাস স্টপের দিকে হেঁটে চলল

সারিকা।

টেলিগ্রামের কাজ সেরে যখন ও বাড়ি ফিরল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। শীতের হাওয়া অভ্যস্ত ভঙ্গিমায় তার রাজত্ব বিছিয়ে দিচ্ছে।

টেলিগ্রাম পেয়ে অনন্যাদেবী আসবেন কি না কে জানে! তবে কর্নেল সেনের দশহাজার টাকা চাঁদা দেওয়ার ইচ্ছেটা তাঁর কাছে নেহাত অগ্রাহ্য করার মতো হবে বলে মনে হয় না।

এলিভেটরে উঠে সুইচ টিপল সারিকা।

নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল যন্ত্রযানের দরজা। শুরু হল আরোহণ।

সারিকার বুকটা অনিশ্চয়তায় বারকয়েক কেঁপে উঠল। ভাবল, যেখানে মানুষকে বিশ্বাস করাটাই মুশকিল, সেখানে মানুষের তৈরি একটা যন্ত্রকে বিশ্বাস কী! যদি এই মুহূর্তে এটা বন্ধ হয়ে যায়! তখন কে শুনতে পাবে সারিকার চিৎকার! এলিভেটরের দরজার ফ্রেমে মোটা রবারের লাইনিং দেওয়া রয়েছে। সেটা ভেদ করে কোনও শব্দ বাইরে বেরোবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু সারিকার সমস্ত দুশ্চিন্তাকে মিথ্যে প্রমাণ করে ছ'-তলায় এসে এলিভেটর থামল।

আজ করিডরের আলো ঠিকমতোই জ্বলছে। এগিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজায় নক করল সারিকা।

পিসিমা দরজা খুলে দিলেন। ওকে দেখেই জিগ্যেস করলেন, 'কীরে, এত দেরি হল! আমরা এদিকে চিন্তা করছি...।'

সরিকা হেসে বলল, 'এখন আর চিন্তার কিছু নেই। কর্নেলকাকুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। উনি সব প্রবলেম সল্‌ভ করে দেবেন বলেছেন।'

সারিকা ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল।

সারিকা মনে এক অপ্রত্যাশিত ঝাঁকুনি খেল। কে ফোন করছে! নিশীথ নয় তো? হয়তো ও কোনও বিপদে পড়েই সারিকাকে ফোন করছে। হয়তো এই মুহূর্তে ওর সাহায্যের প্রয়োজন।

কিন্তু ফোন তুলতেই ওর ধারণা এবং আশঙ্কা আরও একবার মিথ্যে বলে প্রমাণিত হল। কারণ ডক্টর কাপুরের স্বরের তারল্য সারিকার কানে ধরা পড়ল 'হ্যালো' বলামাত্রই।

'আশা করি আমার রং নাম্বার হয়েছে?' ও-প্রান্তের কণ্ঠ ভেসে এল দূরভাষে।

উত্তরে নিজের ফোন নম্বর বলল সারিকা।

'অসম্ভব!' ডক্টর কাপুরের স্বরে একরাশ বিস্ময়, 'এরপর আপনি হয়তো বলে বসবেন আপনার নাম সারিকা মুখার্জি?'

'আপনি আমার নাম জানলেন কেমন করে!' ঠাট্টা করে বলল সারিকা।

'মাই গড! অবশেষে আপনাকে পাওয়া গেল! আমি আনন্দ কাপুর বলছি।'

'আমিও সেইরকম আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু প্রথমে অমন অসম্ভব, অসম্ভব, বলছিলেন কেন? আমাকে কি এক্সপেক্ট করেননি?'

'আর বলবেন না। গত আধঘণ্টা ধরে পাঁচ মিনিট অন্তর-অন্তর আপনার নাম্বারে ফোন করে যাচ্ছি। রেজাল্ট তো বুঝতেই পারছেন! তাই আপনি যখন ফোন তুললেন, তখন ভাবলাম—নির্ঘাত রং নাম্বার হয়েছে।'

সারিকা হাসল : 'হঠাৎ এত জরুরি টেলিফোন? প্রয়োজনটা কী?'

'প্রয়োজনটা গুরুতর—এবং আপনাকে জড়িয়েই। কাল রাতে আমি আপনাকে ফলো করেছিলাম। কারণ, শুনেছিলাম ওই পাথরটার জন্যে আপনার নাকি বিপদে পড়ার পসিবিলিটি আছে। আপনার বাড়ির কাছে পৌঁছে আমি উলটোদিকের একটা গাড়ি-বারান্দার নীচে অপেক্ষায় রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর দেখলাম একজন বেঁটেখাটো গাঁট্টাগোঁট্টা লোক পাতিল ম্যানসন থেকে বেরিয়ে আসছে। জানি না, তার সঙ্গে আপনার কোনও কথা হয়েছে কি না, তবে জানবেন লোকটি সুবিধের নয়।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু ওইরকম কোনও লোককে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।' ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলল সারিকা : 'ডক্টর কাপুর, আজ সকালে আমি মিস্টার বর্মার দোকানে গিয়েছিলাম। বহ্নিশিখা চুরির ব্যাপারে উনি কিন্তু আপনাকেই সাসপেক্ট করছেন।'

'কী? এতবড় সাহস!' রাগে ফেটে পড়লেন ডক্টর কাপুর : 'পাথরটা যদি কেউ চুরি করে থাকে, তো ওই আনঅর্থোডক্স বিজনেসম্যানটাই করেছে। জানেনই তো, কিউরিয়ো কেনা-বেচার লাইনটাই দু-নম্বরী! খবরদার, ওই লোকটার সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করবেন না। ব্যাটা কথায় লোককে ভোলাতে ওস্তাদ।'

সারিকা মনে-মনে হাসল। ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন নামিয়ে রাখল।

সারা সন্ধেটা কীভাবে কাটাবে ভেবে পেল না সারিকা। কাজ যখন নেই, তখন ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করলে কেমন হয়?

যা ভাবা সেই কাজ। ফোন তুলে থানায় যোগাযোগ করল ও। শুনল ইন্সপেক্টর দেশাই থানাতেই আছেন। বাইরের পোশাক ওর পরাই ছিল। সুতরাং মাকে ম্যানেজ করে বেরিয়ে পড়ল সারিকা। বলে গেল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবে।

ফ্ল্যাটের বাইরে আসতেই দেখল নিশীথ আর জারিন আগরওয়াল সিঁড়ি ভেঙে ওপর থেকে নেমে আসছে।

সারিকার দিকে চোখ পড়তেই মুখ ঘুরিয়ে নিল জারিন। নিশীথ কিন্তু হাসল : 'সারিকা, তোমার রাগ এখনও পড়েনি বলে মনে হচ্ছে?'

'পড়েছে!' অভিসন্ধি নিয়ে হাসল সারিকা : 'আমি আর তোমাকে নকল বলে সন্দেহ করছি না। তখন কী যে হয়েছিল হঠাৎ ...।'

'যাক বাবা, বাঁচালে—' নিশীথও হাসল। কারণ হাসি সংক্রামক। বিশেষ করে কোনও প্রমীলার উপস্থিতিতে।

'নিশীথ, কাল সকাল দশটায় এক জায়গায় তোমাকে আমি নিয়ে যাব। আশা করি তোমার আপত্তি হবে না?'

'কোথায়? প্রেসিডেন্সি জেলে?'

'না। আমার এক কাকা কর্নেল বিক্রম সেনের বাড়িতে।' সারিকার মুখে দুষ্টুমির হাসি : 'তিনি বলেছেন, এত ঝড়-ঝাপটার নায়কটিকে তিনি একটিবার দেখতে চান।'

নিশীথ সানন্দে ঘাড় নাড়ল : 'রাজি। তবে ডান হাতের ব্যাপার-ট্যাপারের কথা তোমার কাকাকে মনে করিয়ে দিয়ো। কারণ, অনশনে আমি অভ্যস্ত নই।'

নিশীথ এবং সারিকার হাসিতে জারিনও যোগ দিল। মনে হল, ও আগের চেয়ে অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে।

ওদের পাশ কাটিয়ে লিফটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সারিকা। বোতাম টিপে এলিভেটর উঠে আসার অপেক্ষায় রইল।

নিশীথ সুযোগ পেয়ে রসিকতা করতে ছাড়ল না, 'কী ব্যাপার, তোমার যন্ত্র-আতঙ্ক তা হলে কমেছে!'

'না, কমেনি। তবে উপায় কী?...তা ছাড়া, আগামী অলিম্পিকের ওয়েট লিফটিংয়ে আমি নাম দিচ্ছি না। সুতরাং ছ'-তলা সিঁড়ি ভেঙে ওঠা-নামা করে লাভ নেই।'

এলিভেটরে উঠে বোতাম টিপল সারিকা। যন্ত্রযান নিঃশব্দে নামতে শুরু করল। সেই সঙ্গে সারিকার চিন্তাও নিঃশব্দে এগোতে শুরু করল।

কাল সকালে কর্নেল সেনের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে নিশীথকে রাজি করাতে পেরেছে বলে প্রথমে ও খুশি হল। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে হল এই নিশীথ যদি আসল নিশীথ না হয়, তা হলে সে ওর লিফট-আতঙ্কের কথা জানল কেমন করে! সারিকার স্পষ্ট মনে আছে, ওর এই যন্ত্র-আতঙ্কের মনস্তত্ত্বের কথা নিশীথ ছাড়া বাইরের আর কেউ জানত না। তা হলে?

থানায় পৌঁছে দরজায় দাঁড়ানো কনস্টেবলকে ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের নাম বলল সারিকা। লোকটা যেভাবে ওর আপাদমস্তক জরিপ করল, তাতে মনে হল সে জীবনে এই প্রথম কোনও যুবতীকে দেখছে।

আধমিনিট পর্যবেক্ষণের পর সে সংবিৎ ফিরে পেল। বলল, 'আসুন।'

হয়তো কনস্টেবল থেকে ইন্সপেক্টর জেনারেল হওয়ার আশায় লোকটি পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নিয়ে চর্চা করছে। উন্নতি করার একমাত্র অস্ত্র।

কনস্টেবলকে অনুসরণ করে ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের ঘরে এসে ঢুকল সারিকা। সারিকাকে ওপরওয়ালার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যেন বিরাট একটা উপকার করে গেল, এরকম মুখভাব করে সে বেরিয়ে গেল।

বিরলকেশ মস্তকে একবার হাত চালিয়ে ইন্সপেক্টর দেশাই বললেন, 'বসুন, মিস মুখার্জি—খবর আছে।'

সারিকা একটা চেয়ার নিয়ে টেবিলের এ-প্রান্তে ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের দিকে মুখ করে বসল।

টেবিলে রাখা পেপারওয়েটটাকে দশ আঙুলে নাড়াচাড়া করতে-করতে ইন্সপেক্টর দেশাই সারিকার দিকে চোখ তুলে তাকালেন : 'মিস মুখার্জি, নিশীথ সান্যালের আইডেন্টিফিকেশান সম্পর্কে আমার মনে আর কোনও সন্দেহ নেই। কারণ আঙুলের ছাপ আর হাতের লেখা মিলিয়ে দেখার কাজটা আমি ফেলে রাখিনি—আজই সেরে ফেলেছি। আপনার সমস্ত সন্দেহ ভুল।'

'আমি নিশীথের হাতের লেখা মোটামুটি চিনি। সুতরাং এই জাল নিশীথের হাতের লেখাটা যদি আমাকে একটু দেখান, তা হলে হয়তো চিনতে পারব—আসল কি নকল।'

'চলুন—আমার কোনও আপত্তি নেই।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টর দেশাই : 'আই হোপ য়ু উইল চেঞ্জ ইয়োর মাইন্ড।'

হতাশ ও বিভ্রান্ত সারিকা যখন চক্রবেড়িয়া রোডে পা দিল, রাত তখন পৌনে ন'টা। এই মুহূর্তে নিশীথের পরিচয় নিয়ে সারিকা বেশ দ্বিধায় পড়েছে। ইন্সপেক্টরের দেখানো সাক্ষ্য-প্রমাণ ও নিজের চোখে দেখেছে। দুজনের আঙুলের ছাপে বা হাতের লেখায় এতটুকু ফারাক নেই। কিন্তু তা হলেও সংশয়ের ছায়াটা সারিকার মন থেকে এখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। শেষে হয়তো দেখা যাবে...।

সারিকার কানের পরদা কেঁপে উঠল সুপরিচিত যতি ও গতির ছন্দে। মর্স কোডের প্রথম অক্ষরটা যেন ছায়ার মতো ওকে অনুসরণ করছে। এ-অঞ্চলে রাস্তাঘাট এমনিতেই নির্জন থাকে। তার ওপর শীতের রাতে লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে কাউকে দেখতে পেল না ও। শুধু চলার গতি বাড়িয়ে দিল। কিন্তু ওই অদ্ভুত শব্দটা ওর সঙ্গে আঠার মতো

লেগে রইল।

শেষ পর্যন্ত পাতিল ম্যানসনে ঢুকতেই কিছুটা ভরসা পেল সারিকা। লিফটে উঠে চটপট বোতাম টিপল। এই মুহূর্তে যন্ত্রের চেয়ে মানুষের ভয়টাই ওর কাছে বেশি হল। মনে হল, ছ'তলা যেন আর আসতেই চায় না।

মনে হল, এক দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নিজের ল্যান্ডিংয়ে ও পা রাখল। অবাক চোখে দেখল, ওদের ঘরের দরজার ওপর ঝুঁকে রয়েছে একটা লোক। বারান্দার আলো পড়েছে তার পিঠে, গায়ের জামায় এবং তার ফুলহাতা জামায় লাগানো ধাতব কাফলিঙ্কের ওপর।

সারিকার হৃৎপিণ্ড উন্মাদের মতো ঘুরপাক খেয়ে আচমকা থামল। কাঁপতে লাগল থরথর করে। ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা চাপা অস্ফুট আর্তনাদ।

সেই শব্দে চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল আগন্তুক। ঘুরে তাকাল। তার বাঁ গালের ছোট্ট আঁচিলটা উত্তেজনায় কাঁপছে।

সারিকা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। এ ক'দিনের অষ্টপ্রহর দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ, সমস্ত কিছু ভাবাবেগের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়ে ও বলে উঠল, 'নিশীথ—তুমি তা হলে ফিরে এসেছ! এ ক'দিন কোথায় ছিলে! জানো, সবাই আমাকে...।'

আর কথা শেষ করতে পারল না সারিকা—শরীর এলিয়ে পড়ে গেল।

কিন্তু ঝাপসাভাবে ও যেন দেখল, অনুভব করল, দুটো বলিষ্ঠ হাতের আশ্বাস, আশ্রয়, ওকে আলতো করে জড়িয়ে ধরল। বোজা চোখের ওপর আঙুলের উষ্ণ স্পর্শ অনুভবের সঙ্গে-সঙ্গে চেতনা হারাল সারিকা।

।। এগারো ।।

সারিকা যেন স্বপ্নের ঘোরে সাগরের অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। ওর শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহটা বুদবুদের মতো ধীরে-ধীরে ভেসে উঠতে লাগল চেতনার জগতে।

ওর জ্ঞান যখন ফিরল, বিস্ময় তখনও ওর পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। ব্যাপারটা যে অলীক অথবা মিথ্যে স্বপ্ন নয়—সেটা ও বুঝতে পারল নিশীথের স্পর্শে। ও এমন দৃষ্টিতে নিশীথকে দেখতে লাগল, যেন দীর্ঘ কয়েক বছর পর সে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

নিশীথ হাসল : 'ভয় নেই, আমি এসে গেছি।'

সারিকার স্বপ্নের ঘোর তখনও কাটেনি। ও শূন্য দৃষ্টিতে চারপাশে দেখতে লাগল।

ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা অচেনা মুখগুলো ক্রমশ চেনা হয়ে যেতে লাগল। মা, পিসিমা, পিসেমশাই, সম্রাট আর নিশীথ।

ওঃ, নিশীথ, কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম!

অনেকক্ষণ পর ঘরটাকে নিজেদের ড্রইংরুম বলে চিনতে পারল সারিকা। ও তাড়াতাড়ি উঠে বসল। দেখল, এতক্ষণ ও ড্রইংরুমের সোফায় শুয়ে ছিল।

মা সঙ্গে-সঙ্গে এক গ্লাস জল ওর সামনে ধরে দিলেন : 'এই জলটুকু খেয়ে নে, ভালো লাগবে।'

পিসেমশাই বললেন, 'আমি ডক্টর ভট্টাচার্যকে খবর দিচ্ছি—।'

পিসিমা বললেন, 'চল, ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে তোকে শুইয়ে দিই...।'

সারিকা কোনও কথা বলতে পারছিল না। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল।

মা আর পিসিমা ওকে সাবধানে ধরে-ধরে শোওয়ার ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন।

সারিকা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে নিশীথের দিকে তাকাল। সমস্ত লাজলজ্জা ভুলে সকলের সামনে আকুলভাবে ডেকে উঠল, 'নিশীথ!'

নিশীথ আশ্বাসের হাসি হাসল, বলল, 'আজ শুধু বিশ্রাম। কাল সব কথা হবে।'

পিসেমশাই নিশীথকে বললেন, 'ভাগ্যিস আপনি ছিলেন! তা না হলে একটা বিরাট বিপদ হতে পারত।'

নিশীথ সৌজন্যের হাসি হেসে বলল, 'আসলে ও বোধহয় খুব টেনশানে আছে। কাল সকালে আমি এসে ওর সঙ্গে কথা বলব। তা হলেই বুঝতে পারব কীসের জন্যে এত টেনশান।'

পিসেমশাই আনমনাভাবে বললেন, 'আমি কিছু-কিছু শুনেছি। আপনি কথা বলে দেখুন—।'

নিশীথ 'আসি' বলে চলে গেল।

পরদিন নিশীথের সঙ্গে আলাদা কথা বলতে বসল সারিকা।

চা-বিস্কুটের পালা শেষ হতেই ও কোনওরকম ভূমিকা না করে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'এ দু-দিন তুমি কোথায় ছিলে?'

'সবই বলছি, সু।' নিশীথের কণ্ঠে ব্যগ্র সুর : 'কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই, যে-পাথরটা তুমি নিউ মার্কেট থেকে কিনেছিলে, সেটা কোথায়?'

সারিকা ভীষণভাবে একটা মানসিক ধাক্কা খেল। একটা অজানা সংশয় ওর মনের গহনে ছায়া ফেলে গেল। গলার স্বরকে সংযত করে সংক্ষিপ্তভাবে ও জবাব দিল, 'কিন্তু সে-কথা বলার আগে তোমার এই উধাও হওয়ার কারণ আমার জানা দরকার।'

'রাগ কোরো না, সু।' ওকে বোঝাতে চাইল নিশীথ : 'সেসব কথা বলে তোমার বিপদকে আমি আর বাড়াতে চাই না। শুধু-শুধু তুমি—।'

'চুনিটার নাম বহ্নিশিখা। ওই পাথরটার জন্যেই রোহিত রায় খুন হয়েছে। আমি সবই জানি, নিশীথ।' সারিকা শান্ত স্বরে বলল।

আকস্মিক ভূমিকম্পেও বোধহয় এতটা চমকে উঠত না নিশীথ। বিস্ময়ে তার চোখজোড়া বুঝি ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

'তুমি—তুমি কী করে জানলে!'

'বললাম তো, আমি সবই জানি। শুধু জানি না, প্রেমনাথ ধর, সুখেন বর্মা আর রোহিত রায়ের মধ্যে তুমি কেমন করে আসছ।'

নিশীথ বিস্ময়ে বোবা।

বেশ কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে কী যেন ভাবল নিশীথ। অনুভব করল, ওর দিকে সারিকার স্থির দৃষ্টি।

তারপর হঠাৎ একসময় ও মুখ খুলল, 'রোহিত রায় আমার বন্ধু ছিল। কাশ্মীর থেকে পাথরটা যখন ও এখানে নিয়ে আসে তখন আমি জানতে পারি, ওটা কোত্থেকে কীভাবে রোহিতের হাতে এসেছে। তার কিছুদিন পর রোহিতের মুখে শুনলাম, পুলিশ ওর পিছু নিয়েছে। আমি ওকে বারবার বোঝালাম, পাথরটা জায়গামতো ফেরত দিয়ে দেওয়া উচিত। তা ছাড়া, ওই চুনিটা কোথাও বিক্রি করা ওর পক্ষে অসম্ভব। কারণ, কলকাতার ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টও চুনিটার খোঁজে ক্ষিপ্ত হাউন্ডের মতো ঘুরছে। এরপর অবস্থা আরও জটিল হল—আরও দুটো দল এসে হাজির হল চুনির সন্ধানে। তার মধ্যে একজন কাশ্মীরের এজেন্ট—প্রেমনাথ ধর। আর দ্বিতীয়জনের পরিচয় আমি জানি না। শুধু জানি মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে থেকে রোহিত ভীষণ ভয়ে-ভয়ে ছিল। ও বলত একটা অদ্ভুত শব্দ নাকি ওকে অষ্টপ্রহর ফলো করে বেড়ায়। সেই শব্দের মালিককে ও কখনও চিনতে পারেনি। একবার ভাবত পুলিশ, আবার ভাবত, হয়তো অন্য কেউ।

'আমার বরাবরের চেষ্টা ছিল চুনিটা ফেরত দেওয়া। তাই রোহিতকে আমিও ফলো করতাম। সেদিন নিউ মার্কেটের ওই দোকানে আমি ঢুকেছিলাম রোহিতকে ফলো করে। তার পরের ঘটনা তো তুমি সবই জানো—' থামল নিশীথ।

সারিকা চুপচাপ কী ভাবতে লাগল। তারপর আচমকা জিগ্যেস করল, 'রোহিতকে কে খুন করেছে?'

সারিকার স্বরে চমকে উঠল নিশীথ। অবাক হয়ে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই আমাকে সন্দেহ করছ না! তোমার মনে আছে, যখন সেই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়, তখন তুমি আমার সঙ্গে ছিলে? তা হলে তুমিই বলো, আমাকে সন্দেহ করার কোনও মানে হয়! তা ছাড়া রোহিত আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল।'

সারিকার মুখ থেকে সংশয়ের ভাবটা কেটে গিয়ে হাসি ফুটে উঠল : 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করলাম, নিশীথ।'

'সু, এবার চুনিটা আমাকে দাও। সেদিন তুমি যে কখন ওটা বাক্স থেকে নিয়ে গলায় পরেছিলে, আমি টেরই পাইনি। পরে বাইরে বেরিয়ে দেখি বাক্সটা খালি।'

'চুনিটা আমার কাছে নেই, নিশীথ।'

'তা হলে কার কাছে?' নিশীথ উদগ্রীব, 'আমি চাই না, ওই পাথরটার জন্যে কেউ বিপদে জড়িয়ে পড়ুক।'

সারিকা ভাবছিল কর্নেল সেনের কথা। প্রাণ থাকতে চুনিটার সন্ধান কাউকে জানাতে তিনি বারণ করেছেন। কাউকে নয়।

তা হলে সারিকা কি নিশীথকে বলে দেবে, ওটা কর্নেল সেনের কাছে আছে? নাকি—।

'কী হল—জবাব দাও! চুপ করে থেকো না।' নিশীথ একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

'চুনিটা চুরি গেছে।' সারিকা গত সন্ধ্যার কাহিনী খুলে জানাল নিশীথকে। শেষে বলল, 'এই একই কথা প্রেমনাথ ধর আমাকে জিগ্যেস করছিলেন কাল রাতে। কে যে ওটা চুরি করেছে বলা মুশকিল। আমার মনে হয়, আনন্দ কাপুরই হয়তো পাথরটা সরিয়েছেন।'

মিনিটদুয়েক গুম হয়ে রইল নিশীথ। তারপর আপনমনেই বলে উঠল, 'যে করেই হোক বহ্নিশিখা আমার চাই।'

সারিকা অবাক চোখে চেয়ে রইল নিশীথের মুখের দিকে। দেখল, ওর চোয়াল কেমন শক্ত হয়ে উঠেছে।

'সু, যদি চুনিটার কোনও খোঁজ পাও, তা হলে এই নাম্বারে আমাকে ফোন করে জানাবে।' একটা কাগজে খসখস করে একটা ফোন নম্বর লিখে সারিকার হাতে তুলে দিল নিশীথ : 'আমাকে এখন কিছুদিন লুকিয়ে থাকতে হবে।'

হঠাৎই নকল নিশীথের কথা মনে পড়ল সারিকার। ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'নিশীথ, একটা মজার ব্যাপার তোমাকে জানাতে একদম ভুলে গেছি। তুমি উধাও হওয়ার একদিন পর আর-একজন লোক এসে তোমার ফ্ল্যাট দখল করেছে। বলছে, সে-ই নিশীথ সান্যাল। তার সঙ্গে তোমার চেহারার কিছুটা মিল আছে তা ঠিক। কিন্তু আমি সঙ্গে-সঙ্গেই ধরে ফেলেছি লোকটা জালিয়াত। তাই পুলিশে খবর দিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা সবরকম টেস্টেই অদ্ভুতভাবে উতরে যাচ্ছে। এমনকী তোমার সঙ্গে তার হাতের লেখা পর্যন্ত মিলে গেছে! তবে আমি এখনও হাল ছাড়িনি। কাল সকালেই আছে এক চরম অ্যাসিড টেস্ট। তোমার দিদি কাল আসছেন নকল নিশীথকে শনাক্ত করতে—।'

'সর্বনাশ করেছ, সু!' ভীষণভাবে চমকে উঠল নিশীথ, 'ওই লোকটার নাম রূপক চৌধুরী। ওকে আমিই পাঠিয়েছি। কারণ, আমার অ্যাবসেন্স বিশেষ কয়েকজনের চোখে পড়ুক, তা আমি চাইনি।'

'কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নেই, নিশীথ। তীর আমার হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে। কাল সকাল দশটার রূপক চৌধুরী ধরা পড়বেই।'

নিশীথ চিন্তান্বিতভাবে বলল, 'সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি কী যে করব, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না...আচ্ছা, সু, আমি চলি। চুনিটার কোনও হদিস পেলে আমাকে ফোন করতে ভুলো না।'

সারিকার হাতে আস্তে চাপ দিয়ে হাসল নিশীথ। তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

ও চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সারিকা। সত্যিই, পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে। রূপক চৌধুরীকে নিশীথই তা হলে পাঠিয়েছে? কিন্তু কেন এই লুকোচুরি?

ভাবতে-ভাবতে ঘুমে চোখ বুজে এল সারিকার। কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল ও। দরজা বন্ধ করে পা বাড়াল রান্নাঘরের দিকে।

অনন্যাদেবী যদি সত্যিই কাল সকালে এসে পড়েন, তা হলে রূপক চৌধুরীকে বাঁচানোর কোনও রাস্তা সারিকা দেখতে পাচ্ছে না। ধরা তাকে পড়তেই হবে।

জারিনের কথা ভেবে দুঃখ হল সারিকার।

॥ বারো ॥

দশটা বাজতে তখনও মিনিটকয়েক বাকি।

কর্নেল সেনের বসবার ঘরে সারিকা বসে। বুকে একরাশ উৎকণ্ঠা।

অনন্যাদেবী এখনও এসে পৌঁছননি। আসেনি রূপক চৌধুরীও।

গায়ে চাদর জড়িয়ে বসে একটা গল্পের বই পড়ছিলেন কর্নেল সেন। পাশেই একটা চেয়ারে বসে নীরেন বর্মা। আনন্দ কাপুর আপনমনে কার্পেটের ওপর পায়চারি করছিলেন—একটু অধৈর্যভাবে।

সারিকা এসেছে সবার আগে। এসেই গতকাল রাতে আসল নিশীথের সঙ্গে ওর কথাবার্তার কথা বলেছে কর্নেল সেনের কাছে। তিনি শুধু চুপচাপ মাথা নেড়েছেন। হয়তো কিছু একটা আন্দাজও করেছেন, কিন্তু সারিকাকে কিছু বলেননি।

এরপর এসেছেন নীরেন বর্মা এবং আনন্দ কাপুর। কর্নেল সেনই ওঁদের দুজনকে ফোনে ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ডেকে আনার উদ্দেশ্য বা আসন্ন নাটক সম্পর্কে কোনও আভাস ওঁদের দেননি।

এমন সময় দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল। ডক্টর কাপুরই এগিয়ে গেলেন। দরজা খুলে দিলেন।

ঘরে যিনি প্রবেশ করলেন, তাঁকে চিনতে সারিকার অসুবিধে হল না। কারণ অনন্যা রায়ের পরিচয় রোজকার খবরের কাগজের মাধ্যমে কম-বেশি সকলেরই জানা।

ভদ্রমহিলার চেহারা একটু ভারির দিকেই। সিঁথির সিঁদুর কষ্ট করে দেখতে হয়। সাজগোজ তেমন দৃষ্টিকটু নয়। চোখে চশমা, হাতে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ।

অনন্যাদেবীকে দেখেই হাতের বইটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখলেন কর্নেল সেন। বললেন, 'আসুন, মিসেস রায়—আমারই নাম কর্নেল বিক্রম সেন।' হাত তুলে নমস্কার জানালেন তিনি।

উত্তরে অনন্যাদেবীও প্রতি-নমস্কার জানালেন। এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসলেন।

'আপনি আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি, মিসেস রায়। তা ছাড়া, দেখছেনই তো আমার অবস্থা—গত যুদ্ধের পুরস্কার।' কর্নেল সেন হাসলেন।

অনন্যাদেবী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই তাঁর চোখ পড়ল নিশীথের ওপরে।

খোলা দরজার ফ্রেমে নিশীথ দাঁড়িয়ে। ও কখন এসেছে কেউ খেয়াল করেনি।

'কীরে, তুই এখানে!' তিনি নিশীথকে দেখে রীতিমতো অবাক।

নিশীথও কম অবাক হয়নি। সে সোজা এগিয়ে এল সারিকার কাছে : 'সারিকা, এসব কী ব্যাপার! তুমি শেষ পর্যন্ত দিদিকে এখানে টেনে এনেছ!'

কর্নেল সেন নিশীথকে বাধা দিলেন : 'না, মিস্টার সান্যাল, মিসেস রায়কে আমিই আসতে বলেছিলাম—সামান্য কিছু চাঁদা দেওয়ার জন্যে।'

নিশীথ চুপ করে গেল। কর্নেল সেন এবার ফিরলেন অনন্যা রায়ের দিকে। ডান হাতটা বাড়িয়ে ধরলেন : 'মিসেস রায়, এই নিন—চেকটা রাখুন।'

'ধন্যবাদ।' টাকার অঙ্কের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে মিসেস রায় বললেন, 'এই দশহাজার টাকায় আমাদের অনেক নতুন পরিকল্পনা বাস্তব হয়ে উঠবে।'

এমন সময় চা-জলখাবার নিয়ে ঘরে এল মেরিয়ন।

মিসেস রায় তখন একমনে নিশীথের সঙ্গে গল্প করছেন। সারিকা কান খাড়া করে ওঁদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করল। বেশিরভাগ কথাই পুরনো দিনের, আত্মীয়স্বজন সংক্রান্ত।

না, এরপর নিশীথের পরিচয় সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহই থাকা উচিত নয়। কিন্তু ...।

নানান আলোচনার পর প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ অনন্যাদেবী রওনা হলেন। যাওয়ার আগে কর্নেল সেনকে আরও একবার ধন্যবাদ জানালেন। নিশীথকে ওঁর বাড়ি যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি চলে গেলেন।

অনন্যা রায় ঘর ছেড়ে বেরোতেই ফেটে পড়ল নিশীথ সান্যাল : 'সারিকা, এসব নাটকের অর্থ কী! এখনও কি আমার সম্পর্কে তোমার সন্দেহ যায়নি?'

নিশীথের প্রশ্নের জবাব দিলেন কর্নেল সেন, 'নিরুপায় হয়েই আমাদের এই অ্যাসিড টেস্ট করতে হয়েছে—এবং এখন আমরা শিওর হয়েছি।'

'আমি হইনি।' কাটা স্বরে বলে উঠল সারিকা, 'কারণ, আসল নিশীথ কাল রাতে আমার কাছে এসেছিল। ও বলেছে, এর নাম রূপক চৌধুরী—নিশীথ সান্যাল নয়। আর এই রূপক চৌধুরীকে নিশীথই পাঠিয়েছে ওর জায়গায় অভিনয় করতে।'

'চমৎকার!' নিশীথের স্বরে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল, 'চমৎকার। অ্যাক্টিং লাইনে গেলে তোমার সম্ভাবনা দেখছি আমার চেয়েও বেশি!'

'মিস মুখার্জি, যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে এই অদ্ভুত পরিস্থিতির একটা পসিবল সলিউশান আমি করতে চাই। ধরুন ইনিই নিশীথ সান্যাল...।'

'থাক, নীরেন, আমি জানি তুমি কী বলবে।' নীরেন বর্মাকে বাধা দিলেন কর্নেল সেন, 'কিন্তু সেটা আমি ঠিক এই মুহূর্তেই শুনতে চাই না। আগামীকাল রাতে আমরা প্রথম থেকে শুরু করে সমস্ত অদ্ভুত সমস্যারই সমাধান করার চেষ্টা করব। সারি, কাল সন্ধ্যায় তুই আসবি—আর তোর আসল নিশীথকেও ডেকে আনিস। কারণ, শেষ দৃশ্যে ওর থাকার দরকার আছে।'

সভাভঙ্গের স্পষ্ট ইঙ্গিত। সুতরাং একে-একে সকলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। একমাত্র সারিকা অবুঝের মতো শূন্য দৃষ্টি নিয়ে বসে রইল।

কর্নেল সেন সারিকার মাথায় হাত রাখলেন : 'নীরেন তোকে যে কথাটা বলতে যাচ্ছিল, সেটা আমিই তোকে বলতে পারি। তখন সবাই ছিল বলে আমি নীরেনকে বাধা দিয়েছি। শোন—' সারিকা মুখ তুলে তাকাল : 'অ্যালজেব্রার বহু প্রবলেম এক অদ্ভুত উপায়ে সলভ্ করা হয়। তাকে বলে মেথড অফ ইনভারশন বা বিপরীত অনুপাত পদ্ধতি। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। তুই শুধু নিশীথ সান্যাল আর রূপক চৌধুরীর নামটা ওলট-পালট করে দে, তা হলেই দেখবি সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।'

সারিকা থরথর করে কেঁপে উঠল। মনে হল হঠাৎই পৃথিবীটা উন্মাদের মতো ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। তারপর আচমকা সব থেমে গেল। ঘরের পরিবেশে নেমে এল নিস্তব্ধতার রাজত্ব।

'হ্যাঁ, সারি। তুই যাকে এতদিন নিশীথ ভেবেছিস, সে আসলে রূপক চৌধুরী। আর যাকে তুই রূপক চৌধুরী মনে করেছিস, সে সত্যি-সত্যিই নিশীথ সান্যাল। তা ছাড়া, সে-ই যে আসল তুই তার নানান প্রমাণ পেয়েছিস। নকল নিশীথের কাজগুলো খুঁটিয়ে অ্যানালাইজ করলেই তার জালিয়াতি অতি সহজেই ধরা পড়ে যাবে। মনে করে দেখ, তুই-ই আমাকে বলেছিলি যে, নিউ মার্কেটের দোকানে নিশীথ প্রথমে তোকে চিনতে পারেনি। তুই তাকে ডাকার পর সে ইতস্তত করে এগিয়ে আসে। অর্থাৎ, রোহিত রায়কে অনুসরণ করে সে ওই দোকানটায় ঢোকে। একরাশ নকল পাথরের মধ্যে থেকে আসল পাথরটাকে চিনে নিয়ে সে হয়তো খুঁজে বের করতে পারত, কিন্তু গোলমাল বাঁধালি তুই। তুই ওকে নিশীথ বলে ডাকার পর সে তোর কাছে এগিয়ে আসে। অথচ তোর নাম জানা তো দূরের কথা, তোকে সে জীবনে কোনওদিন দেখেইনি। কিন্তু রূপকের—জানি না, ওটা ওর আসল নাম কি না—উপস্থিতবুদ্ধি আছে। সে তোর হাতের আংটি দেখে বুঝল তোর নামের প্রথম অক্ষর 'এস'। সুতরাং স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুযায়ী শর্টে "সু" নামে তোকে ডাকতে শুরু করল। তুই কিছুটা অবাক হলে সে তোকে একটা ঠাট্টা করে থামিয়ে দেয়।

'নিশীথ সান্যালের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে তুই আগে কোনওদিন মিশেছিস বলে আমার মনে হয় না। তাই চেহারার সামান্য তফাত আর আচার-ব্যবহারের আকাশ-পাতাল ডিফারেন্স তোর চোখে পড়ল না। তুই ওই রূপক চৌধুরীকেই আসল নিশীথ বলে ভাবতে শুরু করলি। তার স্বভাব, চেহারা, সব তোর মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলল। তাই যখন আসল নিশীথ হাজির হল, তুই তাকেই

নকল বলে মনে করলি।'

'তাই যদি হয়, তা হলে রূপক তো চুনিটা নিয়েই সরে পড়তে পারত! আমার সঙ্গে আলাপ জমানোর ওর কী দরকার ছিল?' সারিকা জানতে চাইল।

'ছিল—দরকার ছিল।' কর্নেল সেন বললেন, 'কারণ, যখন সে তোকে দেখতে পায়, তখন তুই চুনিটা হাতে নিয়ে পছন্দ করে ফেলেছিস। সে তো আর দোকানের একঘর লোকের সামনে তোর হাত থেকে পাথরটা ছিনিয়ে নিতে পারে না! তা ছাড়া, মনে করে দেখ, পাথরটা কেনার জন্যে সেও তোকে যথেষ্ট রিকোয়েস্ট করেছিল। কারণ, তুই পাথরটা কিনলে সে পরে কোনও ছলছুতোয় সেটা নিয়ে সরে পড়তে পারবে। সে-চেষ্টাও রূপক করেনি তা নয়। কিন্তু তুই যে রেস্তরাঁয় চুনিটা গলায় পরে বসেছিলি, তা সে বুঝতে পারেনি। তাই ভুল করে খালি বাক্স নিয়েই সরে পড়েছে। পরে যখন দেখেছে বাক্সে পাথরটা নেই, তখন আবার ফিরে এসেছে তোর কাছে—ছদ্মপরিচয়ে—কাল রাতে।' কর্নেল সেন থামলেন।

সারিকার বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সমস্ত ঘটনা আবার প্রথম থেকে ও ভাবতে শুরু করল—সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে।

কর্নেল সেনের সিদ্ধান্তে যে ভুল নেই সেটা ও স্পষ্ট বুঝতে পারল। তা হলে কি রূপকই ওকে কাল রাতে রাস্তায় অনুসরণ করেছিল? রোহিত রায়কে অনুসরণ করার কথা ও তো নিজের মুখেই সারিকার কাছে স্বীকার করেছে। কিন্তু রোহিত রায়কে খুন করল কে?

কর্নেল সেন জবাব দিলেন, 'রোহিতকে কে খুন করেছে, তাও আমি জানি।'

সারিকা চমকে উঠল। বুঝল, ওর শেষ চিন্তাটা নিজের অজান্তেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কৌতূহলী হয়ে ও জানতে চাইল, 'কিন্তু কাকু, ওরকমভাবে কে ফলো করছে বলে তোমার সন্দেহ হয়?'

'সন্দেহ নয়, সেটা সরাসরি জানা যাবে কাল রাতে। তুই বলেছিলি, পেছনে তাকিয়ে তুই কাউকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখিসনি। সেই কারণেই আমার মনে হয়, অনুসরণকারীর পায়ে কোনওরকম দোষ নেই। কিন্তু ওই অদ্ভুত ডট-ড্যাশের মতো পা টেনে চলার শব্দ যখন হয়, তখন নিশ্চয়ই তার পায়ে এমন কোনও ব্যথা আছে, যার জন্যে সে ওইভাবে চলতে বাধ্য হয়। নইলে সাধ করে কেউ ওভাবে একটা স্পেশাল সাউন্ড করে তোর অ্যাটেনশান চাইত না। মোটামুটি সবই আমার জানা হয়ে গেছে, সারি। কাল রাতে তুই রূপককে নিয়ে আয়—সব জানতে পারবি।'

'কিন্তু রূপক চৌধুরী এর মধ্যে কী করে জড়িয়ে পড়ল? ওর এক্সপ্লানেশান

তোমার বিশ্বাস হয়, কাকু, যে রোহিত ওর বন্ধু ছিল, তাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেই...?'

'না। বিশ্বাস হয় না। তবে সত্যি-মিথ্যে আমরা সবই জানতে পারব কাল রাতে।'

॥ তেরো ॥

সে-রাতে সারিকার বহুদিনের আশঙ্কা সত্যি হল।

এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরতে ওর একটু দেরিই হয়েছিল।

পাতিল ম্যানসনের সামনে এসে ও দেখল দরজায় কেউ নেই। এতে ও তেমন অবাক হয়নি। অবাক হল লিফটের কাছে এসে।

লিফট অন্ধকার।

ভেতরের ঘোলাটে বাল্‌বটা কেটে গেছে।

লিফটে উঠবে কি না সেটা দুবার চিন্তা করল সারিকা। কিন্তু না উঠেও উপায় নেই। কারণ এই ক্লান্ত শরীরে ছ'-তলা সিঁড়ি ভেঙে ওঠা ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। সিদ্ধান্ত নিতে-নিতেই দরজার কাছ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ পেল সারিকা। কিন্তু ঘুরে তাকিয়ে দেখল কেউ নেই।

সুতরাং আর সময় নষ্ট না করে ও লিফটে উঠল। বোতাম টিপতে যাবে, শুনল একটা পায়ের শব্দ। যেন কেউ পা টেনে-টেনে হেঁটে আসছে লিফটের দিকে।

আর ভাবতে পারল না সারিকা। চট করে বোতাম টিপে দিল। নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল লিফটের ধাতব দরজা। যন্ত্রযান উঠতে শুরু করল।

একইসঙ্গে সারিকার সেই পুরনো আতঙ্কটা দানা বাঁধতে লাগল। যত সব বাজে ম্যানিয়া—ভাবল ও। মানুষের ভুল হতে পারে, কিন্তু যন্ত্রের কখনও ভুল হয় না। এইসব লিফট তৈরি হওয়ার পর বারবার পরীক্ষা করে দেখা হয় কোনও খুঁত আছে কি না। সুতরাং ভয় পাওয়ার কোনও মানে নেই। এতদিন কেন যে ও ভয় পেয়ে এসেছে কে জানে!

কিন্তু আজ লিফটের ভেতরে ঘন অন্ধকার। দরজাটা যে কোন দিকে সেটা ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না সারিকা। এমন সময় হঠাৎই লিফট থামল।

দরজাটা তক্ষুনি একপাশে সরে যাওয়ার কথা, কিন্তু সরল না।

এই শীতেও সারিকা ভয়ে ঘামতে শুরু করল। প্রাণপণে লিফটের দেওয়ালে

একটানা ধাক্কা দিয়ে চলল। কিন্তু যে-শব্দ তাতে হল, মনে হয় না কেউ তা শুনতে পাবে। তা ছাড়া, লিফটের ভেতরে বসানো কাচের চাকতিতে শেষ নম্বর ও দেখেছিল পাঁচ। অর্থাৎ, লিফট এসে ছ'-তলাতেই থেমেছে। আর পরমুহূর্তেই সেই চাকতির আলোও নিভে গেছে।

আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে গেল সারিকা। দু-হাতে এলোপাতাড়ি আঘাত করে চলল লিফটের ধাতব দেওয়ালে। আর একইসঙ্গে একটানা চিৎকার। সে-চিৎকারের শব্দ বদ্ধ ধাতব খাঁচায় যেন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো মনে হল।

একসময় একটু দম নেওয়ার জন্য থামল সারিকা। আর তখনই শুনতে পেল কারও গলা। যেন ফিসফিস করে কেউ কথা বলছে।

'উত্তেজিত হয়ে কোনও লাভ নেই, মিস মুখার্জি। আপনার চিৎকার কেউই শুনতে পাবে না।'

সারিকা প্রথমে ভাবল, এই ফিসফিসে শব্দটা আসছে লিফটের ওপর থেকে। কিন্তু একটু পরেই বুঝল, না, শব্দটা আসছে দরজার কাছ থেকে। দরজার জোড়ে মুখ চেপে কেউ কথা বলছে।

'...কারণ ছ'-তলার দুটো ফ্ল্যাটের দরজাতেই তালা। লিফট যে ছ-তলায়, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন!'

সারিকা জানে কথাটা মিথ্যে নয়। ওর চিৎকার শোনার লোক ছ'-তলায় কেউ নেই। বিকেলেই ও দেখেছে, জারিন নিশীথের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। পিসিমারাও নিশ্চয়ই মাকে সঙ্গে করে কোথাও বেরিয়েছেন। নইলে ওর ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হয়তো শুনতে পেতেন।

কিন্তু কে এই অদৃশ্য শত্রু?

'মিস মুখার্জি, লিফটের ফিউজ আমি খুলে নিয়েছি। ভেতরের বাল্‌বটাও আমিই খুলে রেখেছি। কেন জানেন? আপনার কাছ থেকে একটা খবর চাই বলে। আশা করি নিজের অবস্থার ভেবে আপনি ঠিকঠাক উত্তর দেবেন। ...বহ্নিশিখা কোথায়?'

'আমি—আমি জানি না।' ঢোঁক গিলে জবাব দিল সারিকা। মনে-মনে অনুমান করার চেষ্টা করল এই গলা কার। সে কি ওর পরিচিত, না অপরিচিত?

'জানেন না?...তা হলে জেনে রাখুন, লিফটের ভেতরে দমবন্ধ হয়ে মারা যেতে সাধারণ মানুষের মিনিটদশেক লাগে। আপনার ক'-মিনিট লাগবে বলতে পারি না।'

'তার মানে!' চিৎকার করে উঠল সারিকা।

'তার মানে এই লিফটে হাওয়া চলাচলের সমস্ত রাস্তাই বন্ধ। ওপরের ভেন্টিলেটারটা আমি অ্যাডেসিভ টেপ দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্বাসকষ্টটা আপনি বেশ স্পষ্টভাবে টের পাবেন।... দেখুন তো, এবার মনে পড়ছে কি না, বহ্নিশিখা কোথায়।'

সারিকা চোখ তুলে ভেন্টিলেটারটা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই নজরে এল না।

তবে নেপথ্য ব্যক্তির কথা যে ঠিক সেটা একটু পরেই বোঝা গেল। সত্যিই, ক্রমশ ওর শ্বাস-প্রশ্বাস যেন ঘন হয়ে উঠছে। লিফটের আবদ্ধ বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছে।

কিন্তু না, শত বিপদেও কর্নেল সেনকে এই নৃশংস শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে না সারিকা। মনের সমস্ত শক্তি এক করে সারিকা বলে উঠল, 'বহ্নিশিখা চুরি গেছে। ওটা কে নিয়েছে আমি জানি না।' কথা বলতে এখন বেশ কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হল সারিকার।

'মিথ্যে কথা!' দরজার বাইরে আগন্তুক হিসহিস করে গর্জে উঠল, 'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন! এখনও সময় আছে, মিস মুখার্জি। নয়তো মনে করে দেখুন, আপনার মোমের মতো শরীরটা সামান্য অক্সিজেনের অভাবে ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠবে। তারপর আপনার নাকের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসবে রক্ত। চোখজোড়া লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসবে কোটর ছেড়ে। এখনও বলুন বহ্নিশিখা কোথায় আছে।'

উত্তরে সারিকা প্রচণ্ড জোরে দরজায় ধাক্কা মারল। প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল গলা ফাটিয়ে।

আবার কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

তারপর হাসির শব্দ ভেসে এল দরজার বাইরে থেকে। আগন্তুকের ফিসফিসে স্বরে বেজে উঠল সম্মোহনের সুর, 'এভাবে চেঁচিয়ে কোনও লাভ হবে না, মিস মুখার্জি। শুধু-শুধু হাঁফিয়ে পড়বেন। যত হাঁফিয়ে পড়বেন তত বেশি অক্সিজেন আপনার দরকার হয়ে পড়বে। অর্থাৎ, মৃত্যুর দরজার দিকে আপনি আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবেন। ...পাথরটা কোথায়, বলুন। এই আপনার লাস্ট চান্স। তারপরও যদি চুপ করে থাকেন, তা হলে আমি সোজা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাব—অফ কোর্স, আপনাকে এ-অবস্থায় রেখেই। সুতরাং জীবন অথবা মৃত্যু, যে-কোনও একটা বেছে নিন।'

লিফটের অন্ধকারে ভীষণ অসহায় বোধ করল সারিকা। ধীরে-ধীরে ও হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। কোনওরকমে উত্তর দিল, 'পাথরটা কর্নেল সেনের কাছে

আছে। এখন দরজাটা খুলে দিন—' সারিকা মাথা ঝুঁকিয়ে পড়ে রইল।

আচমকা আলো জ্বলে উঠল, এবং দরজা খোলার শব্দ হল। মুখ তুলল সারিকা। দেখল দরজা খুলে গেছে। ল্যান্ডিংয়ের আলো ঠিকরে এসে পড়েছে লিফটের ভেতরে।

চট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল সারিকা। ওর সামনে কেউ নেই। তা হলে কি লোকটি সিঁড়ি দিয়েই সরে পড়েছে?

বাইরে এল ও।

কী করবে ভেবে ওঠার আগেই দেখল, লিফট নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। বোধহয় নীচ থেকে কেউ বোতাম টিপেছে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখল সারিকা। না, কেউ নেই।

একটু পরেই লিফট আবার ছ'-তলায় এসে থামল। লিফট থেকে বেরিয়ে এল নিশীথ এবং জারিন। সারিকার অবস্থা দেখে ওদের দুজনের চোখেই ফুটে উঠল বিস্ময় এবং সংশয়।

'কী হয়েছে, সারি?' জারিন এগিয়ে এল ওর কাছে : 'তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে!'

সংক্ষেপে সব ঘটনা খুলে বলল সারিকা। সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে দাঁড়াল নিশীথ। তীরবেগে সিঁড়ি ভেঙে নামতে শুরু করল।

সারিকা আর জারিন একবার ফিরে তাকাল নিশীথের চলে-যাওয়া শরীরের দিকে, তারপর আবার পরস্পরের চোখে চোখ রাখল।

'কর্নেল সেনকে ফোন করে এখুনি সাবধান করা দরকার।' সারিকা বলল।

'চলো—তা হলে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।'

জারিনের ঘরে ঢুকে কর্নেল সেনকে ফোন করল সারিকা।

ও-প্রান্ত থেকে সাড়া পেতেই ও রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, 'কে, কাকু? আমি সারি বলছি।'

'কী ব্যাপার?' কর্নেল সেনের ভরাট কণ্ঠস্বরে কিছুটা উদ্বেগ।

সারিকা সমস্ত ঘটনা গড়গড় করে বলে গেল। শেষে হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, 'লোকটা পুরুষ কি মহিলা সেটাও আমি বুঝতে পারিনি। কারণ, সবসময় সে ফিসফিসে স্বরে কথা বলছিল। আমি শেষ পর্যন্ত সইতে পারিনি, কাকু। লোকটাকে চুনিটার কথা বলে দিয়েছি—।'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ও-প্রান্ত থেকে শোনা গেল, 'তুই এক কাজ কর। ফোন করে নীরেন, আনন্দ এবং ইন্সপেক্টর দেশাইকে এখুনি আমার এখানে আসতে বল। আর তুইও দুই নিশীথকে নিয়ে চলে আয়। রহস্যের শেষ অঙ্কের

অভিনয় আমি আর আগামীকালের জন্যে ফেলে রাখতে চাই না।'

সুতরাং ফোন করে নীরেন বর্মা, ইন্সপেক্টর দেশাই এবং রূপক চৌধুরীকে কর্নেল সেনের বাড়িতে আসতে বলল সারিকা। অবাক হলেও তাঁরা মুখে কিছু বলেননি।

কিন্তু আনন্দ কাপুরকে ফোনে পাওয়া গেল না।

একটু পরেই জারিনের ঘরে ঢুকল নিশীথ।

'নাঃ, কাউকেই দেখলাম না।' নিশীথ হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, 'আর, সারিকা, লিফটের ভেন্টিলেটার তো ঠিকই আছে, কোনও অ্যাডেসিভ টেপ-টেপ কিচ্ছু লাগানো নেই!'

'ও—তা হলে স্রেফ সাইকোলজিক্যালি ভয় দেখানোর জন্যেই লোকটা অমন মিথ্যে কথা বলেছিল।' চিন্তিতমুখে বলল সারিকা, 'যাকগে, নিশীথ, তুমি আর জারিন এখুনি আমার সঙ্গে চলো—কাকুর বাড়িতে যেতে হবে। তিনি বলেছেন, এই সব রহস্যের শেষ অঙ্কটা আর আগামী রাতের জন্যে ফেলে রাখবেন না। অতএব গেট রেডি—কুইক!'

মিনিটখানেক পরেই একটা ট্যাক্সি ওদের তিনজনকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল সতীশ মুখার্জি রোডের দিকে।

॥ চোদ্দ ॥

সারিকা, নিশীথ আর জারিন যখন কর্নেল সেনের বাড়িতে পৌঁছল, তখন রাত প্রায় ন'টা।

বসবার ঘরে ঢুকে ওরা দেখল টেবিলের কাছে রাজকীয় ভঙ্গিতে শাল গায়ে জড়িয়ে বসে আছেন কর্নেল সেন। হাতে একটা গল্পের বই। সামনের টেবিলে রাখা বহ্নিশিখা—আর তার পাশেই একটা কুৎসিত শ্রিসার মেশিন পিস্তল।

দরজা খোলার শব্দে বই থেকে মুখ তুললেন কর্নেল সেন, বললেন, 'আয়, সারি—আর কেউ এখনও আসেনি—তবে এসে পড়বে।'

ওরা লক্ষ করল, ঘরের পুরু কার্পেট তুলে ফেলা হয়েছে। ঘরের এক কোণে চুপচাপ পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে মেরিয়ন।

ওরা তিনজনে একইসঙ্গে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মেশিন পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরেছেন কর্নেল সেন : 'ওয়ান বাই ওয়ান,

প্লিজ। সারি, তুই আগে আয়—। জুতো খোলার কোনও প্রয়োজন নেই।'

সারিকা অবাক হয়ে এক পা এক পা করে ঘরের ভেতরে এগিয়ে এল। চেয়ারে বসল।

তারপর একই ভঙ্গিমায় জুতোর খটখট শব্দ তুলে ঘরে ঢুকল জারিন এবং নিশীথ।

কর্নেল সেনের মুখে হাসি ফুটে উঠল : 'এর জন্যে আমি দুঃখিত, মিস্টার সান্যাল। কিন্তু সেই অদ্ভুত ফলোয়ারকে ধরতে গেলে তার বিচিত্র পায়ের শব্দ আমার শোনা দরকার। তাই আজ ঘরের কার্পেট সরিয়ে ফেলেছি—।'

কর্নেল সেনের কথা শেষ হতে-না-হতেই বাইরে থেকে ভেসে এল ভারি বুটের শব্দ।

ঘরে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর দেশাই। একইসঙ্গে বহ্নিশিখা এবং শ্মিসার মেশিন পিস্তল দেখে চমকে উঠলেন।

বিক্রম সেন হাসলেন : 'এই পাথরটা একটা নটোরিয়াস জুয়েল, ইন্সপেক্টর—এবং শ্মিসার মেশিন পিস্তল ইজ অলসো আ নটোরিয়াস ডার্টি থিং—।'

ইন্সপেক্টর দেশাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিলেন বিক্রম সেন : 'দিস ইজ মাই শো, ইন্সপেক্টর। আপনার ভূমিকা এখানে শুধুমাত্র দর্শকের।'

চুপচাপ একটা চেয়ারে বসলেন দেশাই। মুখে তাঁর হতবুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট।

এমন সময় দেখা গেল দরজায় দাঁড়িয়ে নীরেন বর্মা, আনন্দ কাপুর, রূপক চৌধুরী এবং প্রেমনাথ ধর।

সারিকা চমকে উঠে দাঁড়াল : 'আপনি—আপনি এখানে কী করে এলেন?'

প্রেমনাথ ধর হাসল : 'আপনাদের ফলো করে। আমি নীরেন বর্মা এবং ডক্টর কাপুরের সঙ্গে দেখা করে জেনেছিলাম বহ্নিশিখা তাঁদের কাছে নেই—। তখন ভাবলাম আপনাকে নজরে রাখলে হয়তো পাথরটার সন্ধান পাওয়া গেলেও যেতে পারে...তাই।'

ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন নীরেন বর্মা। কিন্তু কর্নেলের বজ্রকঠিন স্বরে থমকে দাঁড়ালেন।

'একসঙ্গে কেউ ঘরে ঢুকবেন না। একে-একে আসুন। নীরেন—তুমিই প্রথমে এসো—।'

নীরেন বর্মা অবাক হয়ে ছোট-ছোট পা ফেলে ঘরে ঢুকলেন। একটা চেয়ারে বসলেন।

'নেক্সট—আপনি—' কর্নেল সেন শ্মিসার উচিয়ে ধরলেন রূপক চৌধুরীর

দিকে।

রূপক ধীরে-ধীরে সারিকার পাশে এসে বসল।

একইভাবে ঘরে ঢুকল প্রেমনাথ ধর।

সব শেষে এল ডক্টর কাপুরের পালা।

ডক্টর কাপুর একটা চেয়ার লক্ষ করে এগিয়ে আসতে লাগলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়াল সারিকা। রূপক চৌধুরী ও প্রেমনাথ ধর দু-চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইল ডক্টর কাপুরের দিকে।

ডট—ড্যাশ। ডট—ড্যাশ।

মর্স কোডের শব্দটা হাজার মেশিনগানের শব্দের মতো এসে বাজল সারিকার কানে। ও বিকৃতকণ্ঠে এক আর্তচিৎকার করে ছুটে গেল কর্নেল সেনের কাছে। তাঁকে ভয়ে আঁকড়ে ধরল। ডুকরে উঠল অস্ফুট স্বরে, 'না-না—এ হতে পারে না!'

ডক্টর কাপুর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

এবং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন নীরেন বর্মা। শান্ত পায়ে এগিয়ে গেলেন আনন্দ কাপুরের দিকে। ঘরের আলোয় তাঁর টেরিনের কালো স্যুট ঝলসে উঠল। তিনি আনন্দ কাপুরের সামনে গিয়ে থামলেন। মৃদুস্বরে বললেন, 'কাপুর, তোমাকে আমি বন্ধু বলেই জানতাম।' সঙ্গে-সঙ্গে তার বাঁ হাত শূন্যে ঝলসে উঠল। সপাটে এসে আছড়ে পড়ল কাপুরের চোয়ালে।

মেঝেতে ছিটকে পড়লেন আনন্দ কাপুর। তার ঠোঁট কেটে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। নীরেন তাঁকে টেনে তুলতে যাচ্ছিলেন, বিক্রম সেনের কথায় থমকে দাঁড়ালেন।

'নীরেন, দিস ইজ মাই শো। ফিরে এসে চেয়ারে বোসো।'

নীরেন বর্মা চুপচাপ ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। কর্নেল সেন ডক্টর কাপুরকে লক্ষ করে শ্মিসার মেশিন পিস্তল উঁচিয়ে ধরলেন : 'কাপুর, বহ্নিশিখাকে কবজা করার জন্যে বহু পরিশ্রম তোমাকে করতে হয়েছে। সারিকাকে—আমার আদরের সারিকাকে—তুমি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও ছাড়নি। কিন্তু এখন তোমার অত পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। এগিয়ে এসে টেবিল থেকে বহ্নিশিখা তুলে নাও—ওঃ, কাম অন—।'

আনন্দ কাপুর নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলেন।

'এসো, কাপুর—আমার বাড়িতে আমার হুকুম শোনা ছাড়া তোমার উপায় নেই!' গর্জে উঠলেন বিক্রম সেন।

আনন্দ কাপুর জামাকাপড় ঝাড়তে-ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালেন। পা টেনে-টেনে

এগিয়ে এলেন টেবিলের কাছে। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে হাত বাড়ালেন বহ্নিশিখার দিকে।

বিকট শব্দে গর্জে উঠল বিক্রম সেনের হাতের শ্মিসার।

আনন্দ কাপুরের হাত থেকে বহ্নিশিখা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কাপুর রক্তাক্ত ডান হাত চেপে মেঝেতে বসে পড়লেন।

'আই ক্যান্ট টলারেট এনি মোর।' চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর দেশাই।

বিক্রম সেন হাসলেন : 'তা হলে দরজা খোলাই আছে। আপনি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারেন। তা ছাড়া, আপনি তো দেখলেন, কাপুর চুনিটা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল। ঘরের সবাই দেখেছে। জিগ্যেস করুন।'

দেশাই গম্ভীর মুখে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

সারিকা ফিরে এল ওর চেয়ারে।

রূপক চৌধুরী সারিকার কানে-কানে বলল, 'সু, মনে আছে, যেদিন রোহিত রায় মারা যায়, সেদিন ওই স্পটের কাছেই একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে ছিলেন এই আনন্দ কাপুর?'

সারিকার দৃশ্যটা মনে পড়ল। তখন ডক্টর কাপুর এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

ও ঘাড় নাড়ল : 'মনে পড়েছে।'

কর্নেল সেনকে সে-কথা জানাল সারিকা। তিনি নীরবে মাথা নাড়লেন। আনন্দ কাপুরকে লক্ষ করে বললেন, 'রোহিত রায়কে খুন করা হয়েছিল, কাপুর। এখন আমার প্রশ্ন, ওকে পেছন থেকে ধাক্কাটা কে দিয়েছিল, তুমি?'

আনন্দ কাপুর ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর শরীর থরথর করে কাঁপছে। ঠোঁটজোড়ার কাঁপুনি দেখে মনে হল, তিনি কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না।

'কাপুর, তুমি আমাকে চেনো।' শান্ত স্বরে বললেন বিক্রম সেন, 'সত্যি কথা না বলা পর্যন্ত এই শ্মিসারের গুলি একটা-একটা করে তোমার শরীরে ঢুকবে। না, মারা তুমি যাবে না। তবে বাকি জীবনটা তোমাকে হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড হয়ে কাটাতে হবে।' শ্মিসার তাক করলেন কর্নেল সেন : 'প্রথমে বাঁ হাত। এক... দুই...।'

দু-হাতে চোখ ঢাকল জারিন এবং সারিকা। কর্নেল সেন কি পাগল হয়ে গেছেন!

'বিক্রম, প্লিজ—স্টপ—স্টপ!' আকুতি করে পড়ল কাপুরের গলায়, 'বলছি, সব বলছি! ...হ্যাঁ, রোহিত রায়কে ধাক্কা আমিই দিয়েছি!'

'দ্যাট ইজ উইলফুল মার্ডার। অতএব, ইন্সপেক্টর দেশাই, আপনি খুনের চার্জে আনন্দ কাপুরকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।' ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরলেন কর্নেল।

ইন্সপেক্টর দেশাই উঠে এলেন চেয়ার ছেড়ে। আনন্দ কাপুরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন : 'মিস্টার কাপুর, আপনাকে খুনের চার্জে অ্যারেস্ট করা হল।'

আনন্দ কাপুর মাথা নিচু করে এসে বসলেন দেশাইয়ের পাশে। রক্তাক্ত ডান হাতে রুমাল চাপা দিলেন।

কর্নেল সেন আবার মুখ খুললেন, 'মিস্টার প্রেমনাথ ধর, আপনার চুনি আপনি ফেরত নিতে পারেন। এই চুনিটাকে নিয়ে যে-পরিশ্রম আপনাকে করতে হয়েছে, তার জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

প্রেমনাথ ধর এগিয়ে এসে বহ্নিশিখাকে তুলে নিল। পকেটে রাখল। তারপর কর্নেলকে একটা ছোট্ট ধন্যবাদ জানিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসল।

'মিস্টার রূপক চৌধুরী!' রূপক চৌধুরী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল : 'আশা করি আপনার নামের ব্যাপারে আমরা কোনও ভুল করিনি?'

'না।' কর্নেল সেনের প্রশ্নের জবাব দিল সে। স্বর অকম্পিত : 'আমার নাম রূপক চৌধুরীই।'

'সারিকার কাছে আপনি যেসব কথা বলেছেন, তার কতটা সত্যি বলে আমরা মনে করতে পারি?'

'আংশিক।'

'যথা?'

'যথা, রোহিত রায় শুধু আমার বন্ধুই ছিল না—ও আমার ছোট বোনকে বিয়েও করেছিল। ওদের সুমন নামে একটা ছেলে আছে। রোহিত চুনিটা নিয়ে যখন কলকাতায় আসে তখন ওর বিপদের কথা আমরা জানতে পারি। আমার বোন এবং আমি ওকে অনেক বোঝাই। কিন্তু ও তখন লোভে অন্ধ। তাই আমাদের অনুরোধ-উপরোধ ওর কাছে বিরক্তিকর মনে হল। দিনের পর দিন ও পালিয়ে বেড়াতে লাগল। বলত, বিভিন্ন গ্যাং নাকি ওর পিছু নিয়েছে। অর্থাৎ—প্রেমনাথ ধর, ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট, আর—এখন জানলাম—ডক্টর আনন্দ কাপুর।

'আমি আমার ছোট বোনের কান্নাকাটি সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই ভাবলাম, যেভাবে হোক ওই চুনি আমি রোহিতের কাছ থেকে নিয়ে জায়গামতো ফেরত দেব। তাই শেষে আমিও ওকে ফলো করতে লাগলাম। তারপর রোহিত একদিন সন্ধ্যায় মারা গেল। বহ্নিশিখার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এই সূত্রেই।'

রূপক চৌধুরী বসল। সারিকার দিকে ফিরে বলল, 'সু, তোমার সঙ্গে সেদিনের

অভিনয়ের জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু তুমি হয়তো জানো না, এই বহ্নিশিখার ব্যাপারে পুলিশ আমার বোনকে সাসপেক্ট হিসেবে এখনও হ্যারাস করছে। তাই এই পাথরটা ফিরে পাওয়ার জন্যে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমাকে ক্ষমা কোরো, সু—।'

সারিকা আশ্বাসের হাত রাখল রূপকের হাতে। রূপক হাসল : 'নিশীথ সান্যালকে আমি জীবনে কোনওদিন দেখিনি। কিন্তু কী উপায় ছিল, বলো? তুমিই আমাকে নিশীথ বানিয়ে ছাড়লে।'

সারিকা সলজ্জভাবে হাসল।

'রূপক চৌধুরীর কথার সঙ্গে তাঁর কাজ হুবহু মিলে গেছে। অতএব সারি, তোর সব রহস্যের সমাধান এইখানেই শেষ। তবে মিস্টার সান্যালের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্যে তোর ক্ষমা চাওয়া উচিত।' কর্নেল শ্মিসারটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন।

সারিকা নিশীথের দিকে ফিরল : 'নিশীথ, সরি, আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না।'

নিশীথ আর জারিন হাসল।

'আশা করি সেই মাথার ঠিক না থাকার জন্যে মিস্টার চৌধুরীই পুরোপুরি দায়ী।' নিশীথ রসিকতা করতে ছাড়ল না।

সারিকা মাথা নিচু করল।

'সো গুড নাইট টু এভরিবডি।' কর্নেল সেন ঘোষণা করলেন।

সকলেই যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

বিক্রম সেন সারিকাকে লক্ষ করে বললেন, 'সারি, কাল আমাকে একবার ফোন করিস।'

ঘাড় হেলিয়ে দরজার দিকে এগোল সারিকা।

হঠাৎই আনন্দ কাপুর বাঁ হাতের এক হ্যাঁচকায় ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের রিভলবারটা টেনে নিলেন। বিকৃতকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, 'খবরদার! কেউ এক পা নড়বেন না! ইন্সপেক্টর, আপনি তো আমাকে রোহিতের খুনের দায়ে অ্যারেস্ট করলেন, কিন্তু শুনলে অবাক হবেন, সে-বিষয়ে পুলিশকে আমার অনেক অদ্ভুত ব্যাপার বলার আছে।' ইন্সপেক্টরের দিক থেকে কর্নেলের দিকে ফিরলেন তিনি। বাঁ হাতের রিভলবার নাচিয়ে বলে উঠলেন, 'বিক্রম, আমার ডান হাতের বদলে তোমার ডান হাত আমার পাওনা। সুতরাং ...' হয়তো রিভলবারের ট্রিগার টিপতে যাচ্ছিলেন ডক্টর কাপুর, কিন্তু তার আগেই নীরেন বর্মার ভোঁতা অটোমেটিক গর্জে উঠল।

মুহূর্তের জন্যে একটা অপার বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল আনন্দ কাপুরের

মুখে। তারপর তাঁর নিষ্প্রাণ দেহটা মেঝেতে আছড়ে পড়ল।

'এ স্যাড বিজনেস।' বললেন বিক্রম সেন, 'ধন্যবাদ, নীরেন—তুমি গুলি না করলে কাপুর হয়তো সত্যিই আমাকে গুলি করত।'

নীরেন বর্মা শুধু হাসলেন। রিভলবারটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

ইন্সপেক্টর দেশাই উঠে টেলিফোনের কাছে গেলেন। অ্যাম্বুলেন্স কল করে ফোন করলেন।

সকলেই চুপ। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

ঘণ্টাখানেক পর দেখা গেল বসবার ঘরে অতিথিরা কেউ নেই। সবাই চলে গেছেন—শুধু নীরেন বর্মা অধৈর্যভাবে পায়চারি করছেন। কর্নেল সেন হাতের গল্পের বইয়ে মগ্ন। মেরিয়নও কখন যেন ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

রাত প্রায় এগারোটা।

কর্নেল হঠাৎ মুখ তুললেন : 'নীরেন, অনেক রাত হল। তুমি বাড়ি যাও।'

চমকে উঠলেন নীরেন বর্মা। থমকে দাঁড়ালেন : 'হ্যাঁ, যাব। কিন্তু শেষকালে আনন্দ এই কাজ করল! আমি যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'ও তো করেনি।' আবার বইয়ের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন বিক্রম সেন।

'তার মানে!'

'সুখেন এখন কোথায়, নীরেন?' কর্নেল হাতের বইটা বন্ধ করে শ্মিসারের পাশে রাখলেন : 'শুনেছিলাম ও আর্মিতে আছে—।'

নীরেন বর্মা অবাক চোখে তাকালেন তাঁর বন্ধুর হাসিখুশি মুখের দিকে। বললেন, 'ও, তুমি সবই জানো দেখছি!' তাঁর গলার স্বর ভারি হয়ে এল। ঘরের ছাদের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, বললেন, 'ওপরে। ভগবানের কাছে গেছে।'

'তোমার একটা কালো শেভ্রলে গাড়ি আছে?'

'আছে।'

'রোহিত রায় তোমার কী ক্ষতি করেছিল, নীরেন?'

'অনেক। সুখেনকে আমি সারা জীবনে শুধু দুঃখ আর যন্ত্রণা ছাড়া কিছুই দিতে পারিনি। আমাকে বাবা বলে ডাকতে পর্যন্ত ও ঘেন্না করত। তাই ওর মা মারা যাওয়ার পর ও আমার মুখে থুতু ছিটিয়ে মিলিটারিতে জয়েন করল। আমি বাধা দিতে পারিনি। সে-জোর আমার ছিল না। কিন্তু যখন শুনলাম, সুখেন প্রপেলারের ঘায়ে মারা গেছে, আমি বিশ্বাসই করতে পারলাম না।

ক্রমশ জানলাম, ব্যাপার আরও গভীর। রোহিত রায় আমার ছেলেকে ক্রুটালি মার্ডার করেছে। তাই প্রায় একইভাবে রোহিতকে আমি গাড়ি চাপা দিয়ে মেরেছি। তুমিই বলো, বিক্রম, যদি ওর মৃত্যুর শোধ আমি না নিতাম, তা হলে সুখেন কি কোনওদিন আমাকে ক্ষমা করতে পারত! আমার যে নরকেও ঠাঁই হত না!' নীরেন বর্মার চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল: 'এ-কাজে আমি সাহায্য চাইলাম আনন্দের। ও স্রেফ চুনিটার লোভে আমাকে সাহায্য করতে রাজি হল। যখন ও রোহিতকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়, তখনও ও জানত না, রোহিতকে আমি সত্যি-সত্যিই খুন করতে চলেছি। কিন্তু পরে ওই চুনিটার লোভে কাপুর যেন খেপে গেল। সারিকাকে হেনস্থা করতে পর্যন্ত ও ছাড়েনি। সারিকা বড় ভালো মেয়ে—ওর লিফট-আতঙ্কের কথা তোমার কাছেই শুনেছিল কাপুর।'

'কাপুর মারা যাওয়ার আগে তা হলে এইসব কথাই বলতে চাইছিল!'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়লেন নীরেন বর্মা।

'নীরেন, তুমি আমার ছোটবেলার বন্ধু। তা ছাড়া, একটু আগেই তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তাই একঘর লোকের সামনে আমি তোমাকে অপমান করতে চাইনি। কিন্তু...।'

'তুমি কী বলবে, আমি জানি। বিক্রম, আমার রিভলবারের গুলি এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আশা করি এটুকু বিশ্বাস তুমি আমাকে করবে। তা ছাড়া, সংসারে আমার আর কে আছে! সুখেন নেই, কবিতা নেই—সবাই অভিমানে আমাকে পৃথিবীতে একা রেখে ছেড়ে চলে গেছে। তা ছাড়া, কাপুরকে আমি ওর ঋণ শোধ করে দিয়েছি। আমার মনে আর কোনও দুঃখ নেই। শুধু শেষ ইচ্ছে, একা-একা চলে যাওয়ার সময় তোমাদের কয়েক ফোঁটা চোখের জল যেন আমার সঙ্গে থাকে। গুড নাইট।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন নীরেন বর্মা। রুদ্ধ কান্নায় তাঁর সমস্ত শরীর ফুলে-ফুলে উঠছিল।

বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। ওপরে আকাশের দিকে তাকালেন। ঝকঝকে নক্ষত্রের উজ্জ্বল সমারোহ তাঁর চোখের তারায় প্রতিফলিত হল। মাথা নামিয়ে নির্জন কালো রাস্তা ধরে তিনি বিজয়ীর মতো দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে চললেন। যেন নিঃসঙ্গ আলেকজান্ডার গ্রিসের রাজপথ ধরে হেঁটে চলেছেন।

দূরে কোথাও কোনও ঘড়িতে শব্দ করে ঘণ্টা বাজল।